Sri Ramakrishna

Sri Sri Sarada Ma with Sister Nivedita

Swami Vivekananda with Margaret Noble (Sister Nivedita) and some of his followers in Kashmir

Mother-Bhuvaneshwari-Devi

New York, April 6, 1895.

Chicago, September, 1893. On the platform, (l-r) Virchand Gandhi, Dharmapala, Swami Vivekananda, at the Parliament of Religions

Greenacre, Maine, August, 1894

Chicago, September, 1893 at the Parliament of Religions

Swami Vivekananda with inmates of Belur Math

Swami Vivekananda at Baranagar-1887

Swami-Vivekananda with devotees

Chicago, September 1893 with other Indian delegates of the Parliament

স্বামীজীর গল্প

- স্বামী মেধসানন্দ

'স্বামীজী, আমার পিছনে খুব লাগতেন ।'

স্বামীজীর সম্বন্ধে শৈশবের স্মৃতিচারণা করছেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহীভক্ত এবং স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগী, বসুমতীসাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী সুপুরুষ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর আত্মীয়া ও দক্ষিণেশ্বরে তাঁদেরই স্নেহে পরিপালিতা ভবতারিণী দেবী ।

---- আমাকে স্বামীজী শাকচুন্নী বলে ক্ষেপাতেন । খুব কালো ছিলাম দেখতে । কুচকুচে কালো । ভাতের হাঁড়ির কালিকেও হার মানাত । কিন্তু তিনি যখন 'কালো' বলে খেপাতেন তখন ভীষণ রেগে যেতাম । তিনি এসেছেন শুনলে লুকিয়ে পড়তাম । কিন্তু ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করতেন । আর নিজেই হাসতেন । আবার ভালওবাসতেন খুব । আমাকে কাছে ডেকে হাত ভর্তি করে জামরুল, পেয়ারা, কালোজাম দিতেন ।

কী তাঁর ভালবাসা ! এখন যখন ভাবি, চোখ জলে ভরে যায় ।

এক গ্লাস জল আমার হাতে তাঁর চাই-ই চাই । আবার ক্ষেপানোর জন্য বলতেন, 'তোর ঐ কালো হাতে জল খেতে আমার ঘেন্না করে'। সেজন্য জল চাইলে আমি দিতাম না । কিন্তু সে কথা শোনে কে ! বলতেন, দ্যাখ শাঁকচুন্নী, সাধুকে সেবা কর । সাধুকে জল খাওয়ালে গায়ের রঙ ফর্সা হয় । খাইয়ে দ্যাখ, তুই আমার মত ফর্সা হয়ে যাবি । ফর্সা যদি নাও হোস তবে ফুট্‌ফুটে শিবের মত বর নিশ্চয়ই পাবি । নে, এখন জল খাওয়া, পারিস তো এক ছিলিম তামাক খাওয়া ।

শেষ পর্যন্ত জল এনে দিতাম ।

....বিয়ের পরে যখন আমায় স্বামী বলছেন, 'নরেন এসেছে, সুপারি কেটে দাও' । আমি বলেছিলাম, 'আমি পারব না । ও আমায় কালো মেয়ে বলেছে' । ছোট্ট মেয়ে । দুষ্টু মন । 'ওই যে কালো মেয়ে' বলেছে, সে কথাটা ঠিক মনে ছিল !

....বিদেশ থেকে ফিরে এলেন স্বামীজী । বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ কিন্তু তখনো সেই নরেনই ছিলেন ---

হঠাৎই একদিন আমাদের কাশীর বাড়িতে এসে হাজির । সবাই তো একেবারে থ ! সূর্যের মতো দেখতে, যেন আগুন জ্বলছে ! যারা তাঁর সঙ্গে এসেছিল, তাদেরকে বললেন, 'তোমরা সব যাও । আমি আজ এখানে থাকব ।' সবাই চলে গেল ।

....বললেন, 'কই রে শাঁকচুন্নী !' খুব জোরে জোরে কথা বলতেন । 'আমাকে অভ্যর্থনা করলিনি !' আমি তো কেঁদে ফেলেছি । পুরনো কথা মনে পড়ে গেল ।

আমাকে কাঁদতে দেখে আমার দুখান হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমি আজ এলাম, আর তুই এখন কাঁদবি ! তবে আমি যাই । এখানে এলাম দুটো প্রাণ খুলে কথা বলব; আগের মত করে হাসব । তুই রেঁধে তোর ওই কালোহাত দিয়ে সাধুসেবা করবি ।.....

.... নে, এই সব ধড়া-চূড়া খুলে শুলুম তোর মেঝেতে । আগে তো এক ছিলিম তামাক খাই, পরে অন্য কথা ।'

এই বলে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন । তখন কোথায় গেল আমার কান্না ! খাবার ব্যবস্থা করতে ছুটোছুটি শুরু করলাম ।

আমি যেখানে রান্না বসিয়েছি, এসে বসলেন মাটিতেই । বললাম, 'আসন দিই ?'

বললেন, 'না । রাখ তো আদিখ্যেতা । হ্যাঁরে শাকচুন্নী, শেষ পর্যন্ত তোর হাতের চচ্চড়ি খেতে এলাম রে ! এত থাকতে তোর চচ্চড়ি বড়ি দিয়ে মনে পড়ে গেল । ওইটি রাঁধবি বুঝলি ....'

কে বলবে, এ আমেরিকা কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছে ।

আমি যতই বলি, 'ওপরে গিয়ে বস না ।'

বলেন, 'সে কি রে, আমি কি তোর শ্বশুরঘরের লোক যে অমন করছিস ? একটা গান করি । বাদ্যযন্ত্র কিছু আছে ?'

আমি বললাম, 'আমি কি ওসব নিয়ে এসেছি নাকি ?'

'তবে থালাটা দে ।'

থালা বাজিয়েই একটা গান ধরলেন । সে যে কি মধু ! কান ভরে আছে এখনো ।

গান ধরেছেন –

'শ্যামা মা কি আমার কালো রে,

কালো রূপে দিগম্বরী হৃদপদ্ম করে আলো রে !'

আবার ওরই মধ্যে মধ্যে বলছেন,

'শাঁকচুন্নী কি কালো রে !

আমার হৃদপদ্ম করে আলো রে ।'

আর কী হাসি ! বাবা ! কী আনন্দই না ঝরে পড়ছে । আমি তো রাঁধছি, ওই গান শুনে উঠে পালাচ্ছি । তখন বললেন, 'তবে অন্য গান শোন – ঠাকুরকে যে গানে মুগ্ধ করেছিলাম সেই প্রথম দিনের গানটা করি ---

'মন চল নিজ নিকেতনে!

সংসার – বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে' ---

একটার পর একটা গান গেয়ে চললেন । রান্না হলো, স্নান করতে বললাম । নিচে গিয়ে নিজেই কুয়ো থেকে জল তুলে বেশ করে স্নান সারলেন ।

'শাঁকচুন্নী, দে এবারে, সামনে বস, সাধুসেবা কর । চচ্চড়ি দে । ছোলার ডাল মোটা করে রেঁধেছিস । বাহ্, তোর তবে মনে আছে আমি কি চাই ।'

আর মুখে দক্ষিণেশ্বরের কাহিনী । ঠাকুর কেমন করে গাইতেন, নাচতেন, আবার রেগে গিয়ে বকতেন, তারপরই হাত ভর্তি প্রসাদ দিতেন – এইসব ।

তারপর মেঝেতে শুয়ে ঘুম ।

বললেন 'ডাকিস নি '।

লম্বা ঘুম দিয়ে বিকেলে উঠে বললেন, 'ওরে শাঁকচুন্নী, অনেক বছর এমন ঘুম ঘুমোইনি '

সন্ধ্যা কাটিয়ে চলে গেলেন । আমি দুচোখে ওঁর পথ চেয়ে রইলাম ।

বললেন, 'একদম মন খারাপ করবিনি । তোর কিসের দুঃখ !

---তোর ভাবনা তিনি, তাঁর ভাবনা তুই ।

ঠাকুর তোর পা ছড়িয়ে কান্না ভালোবাসতেন, তোকে খেপিয়ে কাঁদাতেন, আজো তাই । তুই পা ছড়িয়ে বসে কাঁদিস ।

দক্ষিণেশ্বরে ছোটবেলায় কাঁদতিস তোর নিজের জন্য, এখন কাঁদিস তাঁর জন্য । নিজের কান্না আর্তনাদ, ঈশ্বরের জন্য কান্না তাঁর গুণকীর্তন ।'

আনন্দময় স্বামীজী, প্রাণোচ্ছল স্বামীজী, রসিক স্বামীজী, প্রেমিক স্বামীজী -- এরকম কত না ছবি তাঁর জীবনীর এ্যালবামে ধরা আছে – যা দেখতে দেখতে কখনও হাসতে হয়, কখনও কাঁদতে হয়, কখনও বা চিন্তামগ্ন হতে হয় ।

পাশ্চাত্ত্যে ধর্মযাজকদের ইমেজ তাঁরা গম্ভীরাত্মা । স্বামীজী একেবারেই তার বিপরীত । তাঁর হাসির, রসিকতার যেন বিরাম নেই । 'প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি'র এক সার্থক বিবরণ । সে রূপ দেখে এক পাশ্চাত্ত্যবাসীর বিস্মিত প্রশ্ন, 'স্বামীজী আপনি কি কখনও গম্ভীর হন না ?' গম্ভীর হয়ে স্বামীজীর চট্‌জলদি জবাব, 'হই বই কি, যখন পেট কামড়ায় ।' বলেই আবার হাসি ।

পাশ্চাত্ত্যে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের অপপ্রচারের ফলে আমেরিকা-ইউরোপের সাধারণ মানুষদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আজগুবি সব ধারণা । যখনই সুযোগ এসেছে স্বামীজী তীব্র পরিহাস করে সেসব ধারণা নস্যাৎ করতে চেয়েছেন । কয়েকটা নমুনা ।

একজনের প্রশ্ন 'স্বামীজী আমি শুনেছি ভারতে শিশুদের নদীতে ফেলে দেওয়া হয় ।'

স্বামীজীর জবাব 'ঠিক । শৈশবে আমাকেও ফেলে দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু আমি এমনই মোটা ছিলাম যে কুমীর আমাকে খেতে পারেনি ।'

আর একবার একজন মহিলা শ্রোতার প্রশ্ন 'ভারতে তো বেছে বেছে মেয়েদের গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয় শুনেছি ।' স্বামীজীর জবাব 'ম্যাডাম, আপনি ঠিকই শুনেছেন । সেই জন্যেই তো সেদেশে এখন প্রসবের দায়িত্ব পুরুষরাই নিয়েছে ।'

আবার কখনও তাঁর পরিহাসপূর্ণ জবাবে এমন গভীরতা থাকত যে বুঝতে গেলে ভাবতে হত । ভ্রমণকালে স্বামীজী কখনও স্টীমার বা ট্রেন ধরার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করতেন না – ফলে গাড়ি ফেল করার ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটত । এ নিয়ে তাঁর পাশ্চাত্যে ভ্রমণসঙ্গীরা কখনও কখনও অনুযোগ করতেন । 'Indians have no sense of time'

স্বামীজীর উত্তর, 'Because we live in eternity- All time belongs to us'.

স্বামীজীর পরিহাস যে সব সময় কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তা নয়, 'প্রাক্টিকাল জোক্সেও' তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত ।

বেলুড় মঠের ঘটনা । জোসেফিন ম্যাকলাউড তাঁর পাশ্চাত্যের অনুরাগিনীদের মধ্যে অন্যতম । স্বামীজী তাঁকে আদর করে 'জো' বলে ডাকতেন । মর্যাদাপূর্ণ তাঁর আচার-আচরণ । এটিকেট সম্বন্ধে সদা সচেতন । স্বামীজীর একবার ইচ্ছে হল তাঁকে নিয়ে মজা করার । স্বামী সুবোধানন্দ, তাঁর সরলতা ও অল্পবয়স্কতার জন্য তিনি গুরুভাই হলেও, স্বামীজী তাঁকে খোকা বলে ডাকতেন । স্বামীজী তাঁকে একদিন ডেকে বললেন, 'খোকা, তুই এই খাবারটা 'জো'কে দিয়ে আয় । সে তোকে নিশ্চয়ই Thank you বলবে । তুই তার উত্তরে 'Don't care' বলে চলে আসবি' । এ একেবারেই এটিকেট বিরুদ্ধ ব্যবহার । সরল সুবোধানন্দ এসব কিছুই সন্দেহ না করেই স্বামীজীর আদেশ পালন করে জিনিষটা জোসেফিনকে দিয়েছেন; জোসেফিন তৎক্ষণাৎ Thank you বলেছেন । সুবোধানন্দজীও স্বামীজীর শেখানো কথা 'Don't care' বলে এব্যাউট টার্ন ।

দেখতে না দেখতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে – স্বামীজী ঠিক যেমনটি আন্দাজ করেছিলেন – জো হাঁফাতে হাঁফাতে স্বামীজীর কাছে এসে রেগে ফেটে পড়েছেন 'What right this lad has to humiliate me !'

জো-র সেই মূর্তি দেখে স্বামীজীর কি হাসি !

আর একটি ঘটনা । গিরীশবাবুর সঙ্গে স্বামীজীর কথা চলছে । স্বামীজী একসময় বললেন, 'দেখ জি,সি,'—স্বামীজী গিরীশবাবুকে 'জি সি' বলে ডাকতেন – 'তুমি যাই বল, সাড়ে তিন হাতের মধ্যে সেই বিরাট পূর্ণব্রহ্ম কখনো আসতে পারেন না ।' গিরীশচন্দ্র বললেন, 'হ্যাঁ হয়, কেন হবে না ?' তর্ক শুরু হলো, কেউই নিজের মত ছাড়তে রাজি নন । ক্রমে বিতর্ক উচ্চগ্রামে উঠল । দুজনেই তো অসাধারণ ধীসম্পন্ন, পন্ডিত এবং বাক্‌যুদ্ধে নিপুণ ।

স্বামীজী শান্তভাবে কথা বলে যাচ্ছেন, কিন্তু গিরীশচন্দ্র ক্রমেই উত্তেজিত । বহুক্ষণ কেটে গেল । গিরীশচন্দ্র আর নিজেকে সামলে রাখতে পারছেন না; স্বামীজীও গিরীশচন্দ্রকে ক্রমে ক্রমে আরও উত্তেজিত করে তুলছেন । শেষে গিরীশচন্দ্র চিৎকার করে মাটিতে হাত চাপড়ে বলে উঠলেন : 'হ্যাঁরে শালা এসেছে, আমি দেখেছি ।'

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উঠে গিরীশচন্দ্রকে আলিঙ্গণ করলেন । দোতলা থেকে সিঁড়িতে নামার সময় স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে বলছেন, 'জি সি-র সাথে দুটো false talk করা গেল । আমার গুরুর এমন একজন শিষ্য আছে, যাকে বিশ্বাসের অতল পাহাড় থেকে কেউ নামাতে পারবে না।

আর স্বামিজীর ভালোবাসা – তার কি তুলনা আছে? সাগরের উপমা সাগর । আকাশের উপমা আকাশ । তেমনি স্বামীজীর ভালোবাসার উপমা স্বামীজীর ভালোবাসা । ভালোবাসার আকর্ষণেই তাঁর জন্ম । আর ভালোবাসাতেই তাঁর স্থিতি । আর ভালোবাসার প্রেরণাতেই তাঁর দেহধারণ থেকে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত শুধু দিয়ে যাওয়া – বিনিময়ে কিছুই না চাওয়া ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মন্তব্য করেছেন, 'স্বামীজীর ছিল সব প্রেমের দৃষ্টিতে কাজ । আমরা তাতে দাগ বুলাচ্ছি মাত্র, তাও হয়ে উঠছে না ।'

সেবক কানাই মহারাজ স্বামীজীর সেবা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তাঁর বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন । স্বামীজী দীর্ঘক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে থেকেছেন যাতে ক্লান্ত সেবকের ঘুম না ভাঙ্গে ।

স্বামিজীর শিষ্য অচলানন্দজী লিখছেন 'স্বামীজী যখন তাঁর শিষ্যদের 'বাবা' 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন তখন যে কি আনন্দ হতো তা বলে বোঝানো যাবে না ।' স্বামীজীর ভালোবাসার সংস্পর্শে অল্পক্ষণের জন্যেও যাঁরা এসেছে তাঁরা আর কখনও তা ভুলতে পারেন নি – বর্ণনা করতেও পারেন নি তার গভীরতা ।

তাঁর ভালবাসায় পাত্র-অপাত্রের, যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার যেমন ছিল না তেমনি ছিল না তার পরিমাণের হিসেব নিকেশ, না ছিল তথাকথিত ঠিক বেঁঠিকের বিচার ।

বেলুড়ে এক মাতাল মাঝে মাঝে আসত ও নাচগান করত । তাকে 'জয়-মা-কালী' বলে ডাকা হত । একদিন মঠে স্বামীজী তাঁর দোতালার ঘরে আছেন এমন সময় হঠাৎ 'জয়মাকালীর' আবির্ভাব । সে নেচে-গেয়ে সবাইকে খুব করে হাসিয়ে চলে গেল । স্বামীজী তাঁর নিজের ঘরে থাকলেও মঠে কোথায় কি হচ্ছে সব টের পেতেন । একটু পরে খোঁজ নিচ্ছেন, লোকটা যে তোদের এত আনন্দ দিয়ে গেল, তাকে কি দিলি!

যখন বলা হল তাকে চার আনা দেওয়া হয়েছে (তখনকার দিনে চার আনা কমপক্ষে এখনকার একশ টাকার সমান) তখন স্বামীজী রেগে গিয়ে বললেন, 'কি, যে লোকটা লাখটাকার আনন্দ দিয়ে গেল তাকে মাত্র চার আনা দিয়েছিস?' তারপর একজনকে একটাকা দিয়ে বললেন 'যা লোকটাকে এই টাকাটা দিয়ে আয় আর ভালো করে 'খেতে' বলিস'।স্বামীজীকে মাতালকে মদ খাওয়ার জন্য টাকা দিতে দেখে সাধুরা অবাক ।

একবার ট্রেনে যাচ্ছেন । একটি স্টেশনে গাড়ি থেমেছে । কানাই মহারাজ (পরে স্বামী নির্ভয়ানন্দ) এসে খোঁজ খবর নিচ্ছেন । একটি মুসলমান ফেরিওয়ালা চানাসিদ্ধ বিক্রয় করছে । স্বামীজী যে কম্পার্টমেন্টে ছিলেন, তার সামনে বারবার আনাগোনা করছে । অমনি স্বামীজী ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন, "ছোলাসেদ্ধ খেলে বেশ হয় ! বেশ স্বাস্থ্যকর জিনিস !" স্বামীজীর মনোভাব বুঝে ব্রহ্মচারী তাকে ডেকে একটি ঠোঙা নিলেন । জিনিসটির দাম হয়ত এক পয়সা; কিন্তু স্বামীজী তাকে কিছু সাহায্য দিতে চান বুঝে ব্রহ্মচারী তাঁকে দিলেন একটি সিকি । স্বামীজী তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে ! কত দিলি?" ব্রহ্মচারী বললেন, "চার আনা ।" তিনি বলে উঠলেন, "ওরে, ওতে ওর কি হবে? দে, একটা টাকা দিয়ে দে । ঘরে ওর বউ আছে, ছেলেপিলে আছে ।" একটু পরে বলছেন, "আহা ! আজ বোধহয় বেশি কিছু হয়নি । তাই দেখছিস না, ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাসের সামনে ফেরি করছে ।" ছোলা অবশ্য কেনাই হলো, ওই পর্যন্ত ! দাঁতেও কাটলেন না ।

'ওইটুকু ছিল তাঁর বিশেষত্ব,' মন্তব্য করছেন স্মৃতিচারক মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় । 'যখন যা ভাবতেন, তার অনেক গভীর পর্যন্ত ভাবতেন । আমরা দেখি জিনিস্টার কত দাম হওয়া উচিত । এক পয়সা কি দুই পয়সা । আচ্ছা এক আনা দিয়ে দাও ! তার জায়গায় চার আনা দিলে যথেষ্ট হলো বলে মনে করি । কিন্তু স্বামীজী ভাবছেন, আ-হা ! তার কত অভাব, কত পোষ্য ! অন্ততঃ একটি দিনের জন্য তারা সকলে খেতে পাক । তাঁর প্রাণের 'এই আহা' তাঁকে যে কতদূর ব্যাথিত, পীড়িত করে তুলত তা তাঁর সেবকরাই শুধু জানতেন ।'

এ কথা সত্য যে সাধারণভাবে স্বামীজী সকলের সাথে সদয়ভাবে ব্যবহার করতেন – উত্তেজিত হওয়ার কারণ থাকলেও সাধারণতঃ উত্তেজিত হতেন না । কিন্তু নিজের গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের সঙ্গে (দেশী ও বিদেশী উভয়ক্ষেত্রেই) সে কথা মেনে চলতেন না । প্রয়োজনে অত্যন্ত কঠোরভাব ধারণ করতেন । তা করতেন তাঁদের সংশোধনের জন্য, তাঁদেরই মঙ্গলসাধনের জন্য । তাঁর প্রেমে তাই আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না । আবার বলতেন, আমি যাকে যত ভালোবাসি, তাকে তত বকি ।

আমেরিকায় থাকাকালীন বিশেষতঃ মহিলারা কেউ কেউ তাঁর প্রায়শঃই প্রতিকূল অবস্থার ও কঠোর জীবনযাপনের মধ্যে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন । তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিস্ ই ওয়াল্ডো এলেন । এলেন প্রতিদিন বহুদূর থেকে এসে তাঁর রান্না বান্না ও গৃহস্থালীর কাজ করতেন, তাছাড়া বক্তৃতার ব্যবস্থাদি করা, নোট লেখা ইত্যাদিও। একদিন স্বামীজী দেখছেন 'এলেন একটা ঘরে বসে নিঃশব্দে কাঁদছেন ।' স্বামীজী উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে এলেন, কাঁদছো কেন ?' এলেন বললেন, 'আমার মনে হয় আমি কিছুতেই আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারছি না । অন্য কেউ বিরক্ত করলেও আপনি আমাকেই বকেন ।' সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী বলে উঠলেন, 'অন্য লোকদের বকবো কি করে? আমি তো তাদের ভাল করে চিনি না । আর ওদের কিছু বলতে পারি না বলেই তো তোমায় এত বকাবকি করি । তা যদি নিজের জনকেই বকতে না পারি, তা আর কাকে বকবো বলো?'

এই ঘটনার পর থেকে মিস্ ওয়াল্ডো স্বামীজীর একটু বকুনি খাওয়ার জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকতেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন এই তিরস্কারই স্বামীজীর ভালোবাসার প্রকাশ ।

স্বামী অচলানন্দ লিখেছেন, 'স্বামীজী যখন প্রচন্ড ক্রোধ প্রকাশ করতেন তখনও তার মধ্যে এক মাধুর্য্য থাকতো – যদিও তা বকুনি শোনা মানুষের হৃদয়ঙ্গম করা সব সময় সহজ ছিল না । আর সে বকুনির ভাষা ছিল একেবারে নিজস্ব । একটা নমুনা দেওয়া যাক ।

শুদ্ধানন্দজী স্বামীজীর সুপণ্ডিত শিষ্য ছিলেন এবং স্বামীজীর ইংরাজী রচনা অধিকাংশ বঙ্গানুবাদ করেছেন । স্বামীজী রেগে গেলে তাঁকে বকতেন

এই বলে 'তোর ঐ ঝাঁ চকচকে মাথায় (মুণ্ডিত মস্তকে) বরিশালের সুপুরি রেখে খড়ম দিয়ে ভাঙবো ।'

কিন্তু তিরুস্কার করার পর যখনই মনে হয়েছে – বা দেখেছেন তিরস্কৃত মানুষটি কষ্ট পেয়েছেন, তখনই একেবারে অন্যভাব ।

সেবক কানাই মহারাজকে তাঁর একবার কোন একটু ভুলের জন্য স্বামীজী কানমলা দিয়েছেন । তারপর হঠাৎ দেখতে পেলেন কানাই মহারাজ লুকিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছেন । স্বামীজী কানাই মহারাজের গলা জড়িয়ে ধরে বলেন, 'বাবা কানাই, দেখতে পেয়েছি । আর কেঁদো না বাবা ।'

তাঁর জীবনের অন্তিমলগ্নে –যদিও তখন তাঁর বয়স চল্লিশও ছোঁয়নি – যখন পাশ্চাত্ত্যে প্রচারজনিত অতিরিক্ত পরিশ্রমে, অনিয়মে, খাদ্য ও বাসস্থানের অনিশ্চয়তার ফলে তাঁর শরীর ভেঙ্গে গেছে, প্রায়ই অসুস্থতায় ভুগছেন অথচ স্বধামে প্রত্যাবর্তনের আগে সীমিত সময়ের মধ্যে গুরুর অর্পিত দায়িত্বস্বরূপ তাঁর মিশনকে এক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর গভীর উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা । এই পরিস্থিতিতে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি এবং ক্রোধের প্রকাশের ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটতো যদিও তার জন্য নিজেও কষ্ট কম পেতেন না ।

একবার বেলুড় মঠে গঙ্গার উপর ঘাট নির্মাণকে উপলক্ষ করে স্বামীজী রাজা মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) প্রচণ্ড গালাগাল করেছেন – যদিও সে ব্যাপারে ব্রহ্মানন্দজীর কোন দায়িত্ব ছিল না । কিন্তু ব্রহ্মানন্দজী প্রাণপ্রিয় স্বামীজীর অসুস্থ শরীরের কথা ভেবে স্বামীজীর কথার কোন প্রতিবাদ না করে নিঃশব্দে শুনে গেলেন । একটু পরেই স্বামীজীর মনে হয়েছে রাজাকে এতখানি বকা ভাল হয় নি । তখন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী – যিনি আসলে ঘাটের কাজের তত্ত্বাবধান করছিলেন – তাঁকে ডেকে বললেন, 'দ্যাখ তো রাজা কি করছে !' বিজ্ঞান মহারাজ গিয়ে দেখেন রাজা মহারাজের দরজা জানালা বন্ধ । ফিরে এসে স্বামীজীকে সেকথা বলতে স্বামীজী ধমক দিয়ে বললেন, 'তোকে বললাম দেখে আসতে রাজা কি করছে আর তুই বলছিস কি না ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ।' তখন বিজ্ঞান মহারাজ আবার গিয়ে রাজা মহারাজের ভেজানো দরজা আস্তে আস্তে খুলে দেখেন রাজা মহারাজ কাঁদছেন । দেখে বিজ্ঞান মহারাজ খুব অনুতপ্ত হয়ে বললেন, 'মহারাজ, আমার জন্যেই আপনাকে বকুনি শুনতে হল ।' রাজামহারাজ বললেন, 'ভাই, আমাকে তো বকেইছেন – আমার পিতৃপুরুষকেও ছাড়েন নি ----।'

যাহোক বিজ্ঞান মহারাজ ফিরে গিয়ে স্বামীজীকে যেই বলেছেন রাজা মহারাজ ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদছিলেন, স্বামীজী ঝড়ের মত ছুটে গিয়ে রাজা মহারাজকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন, 'ভাই রাজা, তুই আমাকে ক্ষমা কর । অসুখ বিসুখে আমার মাথার ঠিক নেই । ভাই আমি তোদের সঙ্গে থাকার উপযুক্ত নই । মঠ ছেড়ে আমি হিমালয়ে চলে যাব ।' স্বামীজীর এই ভাব দেখে রাজা মহারাজ অবাক হয়ে কান্না থামিয়ে স্বামীজীকে প্রবোধ দিচ্ছেন আর বলছেন, 'তুমি চলে গেলে আমরা কাকে নিয়ে এখানে থাকব । তুমি যে আমাদের মাথার মণি !'

শুধু যে গুরুভাই – শিষ্য – ভক্তদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রগাঢ় ছিল তাই নয়, অসহায় – নিপীড়িত –পাপীতাপীর প্রতি তা পূর্ণবেগে ধাবিত হত । শুদ্ধানন্দজী লিখছেন, স্বামীজী কথা প্রসঙ্গে যখন একবার বলছিলেন 'মহাপাপীকেও ঘৃণা করলে চলবে না', তখন তাঁর মুখচোখে এমন দিব্য ও সুগভীর ভালবাসা ফুটে উঠেছিল যে তিনি কখনও তা বিস্মৃত হতে পারেন নি ।

দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা তো সর্বজনবিদিত । মহাত্মা গান্ধীর উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছিলেন, 'বিবেকানন্দর রচনাবলী পাঠের পর দেশের প্রতি আমার ভালবাসা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়েছিল ।' কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম সাধারণ দেশপ্রেমিকদের দেশপ্রেম থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল । অখণ্ডানন্দজী সুন্দর করে তা ব্যাখ্যা করেছেন, 'স্বামীজীর দেশপ্রেম অত সোজা নয় । এ patriotism নয় –দেশাত্মবোধ ।

সাধারণ লোকের হচ্ছে দেহাত্মবোধ, তাই দেহের সেবাযত্নে বিভোর । তেমনি স্বামীজীর হচ্ছে দেশাত্মবোধ – তাই সারা দেশের সুখ দুঃখ, ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান নিয়ে তাঁর চিন্তা । '

ইতিহাসে দেশপ্রেমের অনেক উদাহরণ থাকলেও দেশাত্মবোধের উদাহরণ খুবই বিরল । কিন্তু দেশের মানুষ—দেশের উন্নয়ন নিয়েই কেবল মাত্র তাঁর চিন্তা ছিল না । তা ভাল হলেও এক বিচারে তা মায়ার অন্তর্গত । যেমন শ্রী রামকৃষ্ণ বলেছিলেন শুধু নিজের পরিবারের, নিজের ধর্ম, নিজের দেশকে ভালবাসা মায়ার অন্তর্গত ।

অখণ্ডানন্দজী সেই জন্য এ প্রসঙ্গে আরও লিখছেন –'দেশাত্মবোধ তাঁর শেষ নয়, এর পরও আছে বিশ্বাত্মবোধ । জগতের সকল জীবের জন্য চিন্তা – তাদের ভক্তিমুক্তি কি করে হবে, সেও তাঁর চিন্তা; সবার মুক্তি না হলে তাঁর মুক্তি নেই । সমস্ত দেশের মানুষের সুখ দুঃখে তাঁর সুখ দুঃখ বোধ ।'

'একদিন বেলুড় মঠে রাত দুটোর সময় স্বামীজীর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে ।' বলছেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী । '(স্বামীজী) বারান্দায় পায়চারি করছেন । জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি স্বামীজী, আপনার ঘুম হচ্ছে না ?' স্বামীজী বললেন, 'দেখ পেসন, (পেসন—হরিপ্রসন্ন, বিজ্ঞানানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম) আমি বেশ ঘুমিয়েছিলাম । হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা লাগল আর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল । আমার মনে হয়, কোন জায়গায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এবং অনেক লোক তাতে দুঃখকষ্ট পেয়েছে ।'

স্বামীজীর এই কথা শুনে আমি ভাবলাম, কোথায় কি দুর্ঘটনা হলো আর স্বামীজীর এখানে ঘুম ভেঙ্গে গেল – এটা কি সম্ভব ! এরকম চিন্তা করে মনে মনে একটু হাসলাম । কিন্তু আশ্চর্য্য ! পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখি গতরাত্রে দুটোর সময় ফিজির কাছে একটি দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে বহু লোক মারা গিয়েছে, বহু লোক নিরাশ্রয় হয়েছে, অর্বণনীয় দুঃখের সম্মুখীন হয়েছে ।

খবরটি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম । দেখলাম সিসমোগ্রাফের (পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কম্পন পরিমাপের যন্ত্র) চেয়েও স্বামীজীর nervous system more responsive to human miseries !'

পশুপক্ষীদের প্রতি ভালবাসাও কি স্বামীজীর কম ছিল ! স্বামীজীর শরীর যখন বিশেষ অসুস্থ অথচ তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তারও বিরাম নেই যা দুর্বল শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক তখন ডাক্তাররা তাঁর গুরুভাইদের পরামর্শ দিলেন কিছু জীবজন্তু পুষুন, তাহলে স্বামীজীর মন তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ।

তদনুযায়ী মঠে ভেড়া, ছাগল, হাঁস, কুকুর পোষা হতে থাকল । স্বামীজী তাদের এক একটা নাম দিয়েছিলেন । কখনও কখনও কেবল মাত্র কৌপীন ধারণ করে হাতে লাঠি নিয়ে রাখাল সেজে তাদের সঙ্গে খেলা করতেন । কখনও বা পরম মমতার সঙ্গে তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন – আর তারাও তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত ।

মনে প্রশ্ন জাগে আমাদের হৃদয়েও ভালবাসা আছে – আমরা ভালবেসে থাকি । স্বামীজীর ভালবাসা ও আমাদের ভালবাসার পার্থক্য কোথায় ?

আমরা স্বরূপতঃ মুক্ত কিন্তু ভালবাসতে গিয়ে নিজেরাও বাঁধা পড়ি, অন্যদেরও বেঁধে ফেলি । আমরা শুদ্ধ ও আত্মস্বরূপ, কিন্তু ভালবাসা আমাদের দেহ-মনে-বুদ্ধিতে আবদ্ধ থাকে - আত্মার দিকে প্রসারিত হয় না । আমরা অনন্ত, আমাদের ভালবাসাও অনন্ত, কিন্তু সীমিত কয়েকজনকে ভালবেসেই আমাদের ভালবাসা যেন নিঃশেষ হয়ে যায় । আমরা পূর্ণ – কিন্তু আমাদের ভালোবাসায় চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্খা থাকায় আমাদের অপূর্ণত্ব ঘোচেনা । আমাদের ভালবাসা জোয়ার দিয়ে শুরু হয় কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে ধরে ভাটার টান । ফলতঃ সাধারণ ভালবাসা মোহগ্রস্ত, মোহমুক্ত নয় । তা আমাদের বন্ধন করে মুক্ত করে না, সংকীর্ণ করে উদার করে না । তাতে আছে আনন্দ-নিরানন্দের দোলাচল ---নেই নিত্যানন্দ, নেই প্রশান্তি । এর একটিই কারণ – আমাদের অসীম, অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দময় প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা । কিন্তু স্বামীজীর এবং তাঁর মত আত্ম-উপলব্ধিবান পুরুষের ঐরূপ অজ্ঞতা না থাকায় তাঁদের ভালবাসা দিব্য, শুদ্ধ, মুক্ত, প্রসারিত, অসীম, অনন্ত ও উদার । অথচ গভীর ও সমস্রোতা ।

স্বামীজী বলছেন আমি উন্মাদের মত ভালবাসি । কিন্তু দরকার হলে আমার হৃৎপিণ্ডকে ছিঁড়ে ফেলতে পারি । অর্থাৎ তাঁর ভালবাসা সুগভীর অথচ মোহমুক্ত । নিজেদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যারা স্বামীজীর দিব্য-প্রেমময়-আনন্দময় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে কোন –না কোন ভাবে এসে পড়েছে, তারা শুধু যে তা ভুলতে পারেনি তা নয় সেই স্মৃতি তাদের চেতনার মধ্যে এমন একটা দুরপনেয় ছাপ ফেলেছে যা পরিণামে তাদের অন্তরের সুপ্ত দিব্য ভাবের উদ্বোধন ঘটিয়েছে । এমনই ছিল স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি ও প্রভাব ।

স্বামীজীর ভালোবাসা শুধু দিব্য ছিল না – তার মধ্যে ছিল ভালোবাসার পাত্রের প্রতি – সে ব্যক্তি হোক, জাতি হোক, কি সমগ্র মানবসমাজ হোক – সুগভীর সমবেদনা, সহানুভূতি ও তাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উভয়বিধ কল্যাণেচ্ছা । কিন্তু কল্যাণেচ্ছা থাকলেই হয় না । সেই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে উপযুক্ত শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও সামর্থ্য থাকা দরকার । যিনি একাধারে তাঁর ইষ্ট ও গুরু সেই শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ও তাঁর নিকটে লব্ধ এবং নিজের পূর্বজন্মের ও ইহজন্মের সাধনলব্ধ শক্তিতে স্বামীজী শক্তিমান ছিলেন । ফলে তাঁর কল্যাণ করার শক্তিও ছিল, সামর্থ্যও ছিল । এরই পরিণামস্বরূপ আমরা দেখছি, স্বামীজীর আবির্ভাবের ১৫০ বৎসর পরেও তাঁর ভালোবাসা দিকেদিকে কল্যাণস্রোতে প্রবাহিত হয়ে ব্যক্তিমানুষের, ভারতের ও পাশ্চাত্যের তথা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলসাধন করেছে এবং করছেও ।

জয়তু স্বামীজী ।।

স্বামী বিবেকানন্দের টান

- সন্দীপন সেন

(অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ)

স্বামী চন্ডিকানন্দের লেখা একটা গানে আছে,

'বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ওই যে ডাকিছে, "আয়রে আয়"
আহ্বানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায়'।

এটা ঘটনা, স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর বাণীর আকর্ষণে শত-সহস্র মানুষ ছুটে গেছেন, এঁদের কেউ তাঁকে চাক্ষুষ করেছেন, কেউ বা কেবল তাঁর বাণীমূর্তি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন । কিন্তু কেবল কি 'মহারথীরা'ই তাঁর আহ্বানে ছুটে গেছেন ? না কি যাঁরাই তাঁর কাছে ছুটে গেছেন জাতি-কুল-মান নির্বিশেষে তাঁরাই 'মহারথী' হয়ে গেছেন ? আসলে দুটোই সত্যি । এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা এমন কিছু মানুষের কথাই বলব, যাঁদের কেউ মহারথী বলেই বিবেকানন্দের টান উপেক্ষা করতে পারেন নি, আবার কেউ বিবেকানন্দরূপ পরশমণির স্পর্শে মহারথী হয়ে উঠেছেন । আর এর মধ্যে দিয়ে বিবেকানন্দের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য দিক হয়ত আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে !

আত্মার স্বরূপ

সালটা ১৮৮১-র শেষ কি '৮২-র শুরু । বাবুরাম, পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ, তখন সবে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত শুরু করেছেন । সেদিন তিনি ভক্ত রামদয়ালবাবুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে দেখা করতে গিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে থেকে গেছেন । হঠাৎ গভীর রাতে বাবুরাম অবাক হয়ে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে আলুথালু বেশে তাঁদের বিছানার পাশে এসে রামদয়ালবাবুকে জাগিয়ে বলছেন, "দেখ, নরেন্দ্রর জন্য প্রাণের ভিতরটা গামছা নিঙড়ানোর মতো জোরে মোচড় দিচ্ছে, তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো ।" শুধু একবার নয়, সে রাতে বারে বারেই শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবে তাঁদের কাছে ফিরে এসে নরেনের জন্য তাঁর প্রাণের টান ব্যক্ত করছিলেন । বাবুরাম তখনও নরেন্দ্রকে চেনেন না । শুধু এইটুকু ভেবে কষ্ট পেলেন যে "সে ব্যক্তি কি কঠোর !" যার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ভালবাসা ।[২]

১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর জন্মোৎসবের ভরা সমাবেশে নরেনের সামনেই শ্রীরামকৃষ্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, "আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি ; আর আমি ওর অনুগত ।"[২]

আর একবার বলরামের বাড়িতে কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে মুক্তকণ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে সহস্রদল পদ্ম, জালা, দীঘি, রাঙাচক্ষু বড় রুই, বড় ফুটোওয়ালা বাঁশ, পুরুষ পায়রা প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করে বললেন, "এত ভক্ত আসছে, ওর মতো একটি নাই ।" ----নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল !"[৩]

সর্বদা ভগবদ্ভাবে সমাধিমান শ্রীরামকৃষ্ণেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসা অন্যান্যদের দশা কি হবে তা সহজেই অনুমেয় ।

নরেনের সঙ্গ

রাখাল, ভাবীকালের স্বামী ব্রহ্মানন্দ, নরেন্দ্রের সমবয়সী, সতীর্থ, গুরুভাই । শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে তিনি তখন বরাহনগর মঠে আছেন । মনে তীব্র বৈরাগ্য, সাধ একাকী নর্মদাতীরে গিয়ে সাধনায় ডুব দেবেন । কিন্তু নরেনের টান ফেলে যেতে পারছেন না । আর যেন নিজের মনকেই প্রবোধ দিতে মঠ ছেড়ে তপস্যায় যেতে উৎসুক অপর গুরুভাই সারদাপ্রসন্নকে বলছেন, "এখানে সাধুসঙ্গ । এ ছেড়ে যেতে আছে ? আর নরেনের মতো লোকের সঙ্গ । এ ছেড়ে কোথায় যাবি ?"[৪]

তো আমার নাম গঙ্গাধর নয়

গুরুভাইদের মধ্যে গঙ্গাধর বা স্বামী অখন্ডানন্দের প্রতি বিবেকানন্দের বিশেষ স্নেহ ছিল। আদর করে তিনি গঙ্গাধরকে 'গ্যাঞ্জেস' বলে ডাকতেন । ১৮৯০ সালে পরিব্রাজক রূপে হিমালয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার আগে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এই গঙ্গাধরকেই বলেছিলেন, "বাবা, তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলাম । তুমি পাহাড়ের সকল অবস্থা জানো ---- দেখো, যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয় ।"[৫] এ যাত্রায় ১৮৯০এর জুলাই থেকে ১৮৯১এর মার্চ অবধি অখন্ডানন্দ হিমালয় তথা উত্তর ভারতের নানান্ তীর্থে স্বামীজীর সঙ্গে ভ্রমণ করে খুব আনন্দ পান । কিন্তু এরপর স্বামীজী গুরুভাইদের সঙ্গ ত্যাগ করে নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকের জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন । বললেন, "আমি এবার একলা বেরুব । কোথায় আছি, কোথায় যাচ্ছি, কাউকে সন্ধান দেব না ।" গঙ্গাধর অমনি উত্তর দিলেন, "বেশ, তুমি যদি পাতালে যাও, আর সেখান থেকে যদি তোমায় খুঁজে বের করতে না পারি তো আমার নাম গঙ্গাধর নয় ।" শুরু হল এক অদ্ভুত অভিযান । মীরাট থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে আগ্রা, আগ্রা থেকে বৃন্দাবন, বৃন্দাবন থেকে এটাওয়া, এটাওয়া থেকে আবার বৃন্দাবন হয়ে জয়পুর, সেখান থেকে আজমীর, আজমীর থেকে পুষ্করসহ রাজস্থানের নানা স্থান ও গুজরাটের উপকূলবর্তী নানা শহর ঘুরে আহমাদাবাদ, আহমাদাবাদ থেকে জুনাগড়-দ্বারকা-বেটদ্বারকা, সেখান থেকে নারায়ণ সরোবর – এভাবে প্রায় এক বছর অক্লান্ত ভাবে খোঁজ চলেছে । যেখানেই যান শোনেন ক'দিন আগেই স্বামীজী সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেছেন । একবার তো ডাকাতের খপ্পরে পড়ে প্রাণসংশয় পর্যন্ত হয়েছিল । কিন্তু অখন্ডানন্দ আপন লক্ষ্যে অবিচল । স্বামীজীকে খুঁজে পেতেই হবে । অবশেষে নারায়ণ সরোবর থেকে ধূ ধূ মরুপ্রান্তর পেরিয়ে মান্ডবী এসে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল । সেখানে এক ভাটিয়ার বাড়িতে গঙ্গাধর প্রাণপ্রিয় নরেন্দ্রের সাক্ষাৎ পেলেন । এই ছিল স্বামীজীর আকর্ষণ শক্তি !

চাঁদমুখে ছাই মাখ

১৮৮৭ সালের শেষদিকে হাথরাস রেলওয়ে স্টেশনের সহকারি স্টেশন মাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত হঠাৎ একদিন দেখলেন ট্রেনের কামরায় "এক লাল সুন্দর পাগড়ি বাঁধা বড় বড় চোখওয়ালা সাধু" যাচ্ছেন । দেখেই মনে পড়ল ক'দিন আগে এঁকেই যেন স্বপ্নে দেখেছেন ! এগিয়ে গিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য । আমন্ত্রণ স্বীকার করে স্বামীজী ক'দিন পরে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এলেন । একদিন শরৎচন্দ্র স্বামীজীর কাছে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলেন । উত্তরে 'বিদ্যাসুন্দর'এর একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে স্বামীজী বললেন, "বিদ্যা যদি লভিতে চাও, চাঁদমুখে ছাই মাখ, নইলে এই বেলা পথ দেখ ।" অমনি শরৎচন্দ্র খপ্ করে উনুন থেকে কিছুটা ছাই মুখে মেখে স্বামীজীর সামনে উপস্থিত হলেন । হাথরাস ছেড়ে যাবার সময় শরৎচন্দ্রও স্বামীজীর শরণ নিলেন, এবং হরিদ্বার-হৃষিকেশ প্রভৃতি তীর্থে গুরু-শিষ্য কয়েক মাস কাটালেন । পথে অসুস্থ হয়ে পড়ায় একবার স্বামীজী শরৎচন্দ্রের জুতো পর্যন্ত বহন করেছিলেন । পরে তিনি বরাহনগর মঠে গিয়ে স্বামীজীর কাছে বিধিবদ্ধ সন্ন্যাস নিয়ে হলেন স্বামী সদানন্দ । পরবর্তীকালে সদানন্দ বলতেন, "আমরা স্বামীজীর কাছে তাঁর গ্ল্যামার দেখে আসিনি । ত্রিতাপতাপিত হয়ে মুক্তির জন্য আসিনি । -- নরেন দত্তের পিরিতে পড়ে এসেছি । সাফ কথা !He was all love—তাঁর সব সত্তাটাই প্রেমময় --- ভালবাসা জমাট ।"[৬]

গুরু-শিষ্য

১৮৯১ সালের জুন মাস । স্বামীজী তখন আবু রোডে এক মুসলমান উকিলের বাড়িতে অতিথি হিসেবে রয়েছেন । একদিন খেতরি-রাজের ব্যক্তিগত সচিব মুন্সী জগমোহনলাল সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এত মুগ্ধ হলেন যে, ফিরে গিয়ে রাজা অজিত সিংকে তা সবিস্তার জানালেন । অজিত সিং সেদিনই স্বামীজীকে দেখতে তাঁর আবাসে যেতে চাইলেন । সেকথা শুনে স্বামীজী স্বয়ং অজিত সিংএর সঙ্গে দেখা করতে রাজভবনে উপস্থিত হলেন । রাজা প্রশ্ন করলেন, "স্বামীজী, জীবন মানে কি ?" স্বামীজী উত্তর দিলেন, "প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি চেষ্টা করছে জীবকে দাবিয়ে রাখতে, আর তাদের গ্রাহ্য না করে অন্তঃশক্তি স্বীয় আবরণোন্মচন বা ক্রমবিকাশ করে চলেছে – তাকেই বলে জীবন ।" কথাগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি যেন তাঁর নিজের জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট, বৈরাগ্য ও তিতিক্ষাসঞ্জাত অভিজ্ঞতার নির্যাস ঢেলে দিয়েছিলেন । অজিত সিং অভিভূত হয়ে পড়লেন । আবার প্রশ্ন করলেন, "স্বামীজী, তাহলে শিক্ষার মানে কি ?" স্বামীজীর ততোধিক সপ্রতিভ উত্তর, "আমার মতে শিক্ষার মানে হল কতকগুলি ভাবকে অস্থিমজ্জাগত করা ।" এইভাবে প্রশ্ন-পরিপ্রশ্নে মিনিট, ঘন্টা, দিন প্রভৃতি সময়ের বাঁধাধরা নিয়ম ভেসে গেল । অবশেষে অজিত সিংএর সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী তাঁর সঙ্গে খেত্‌রি গেলেন । রাজা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন । স্বামীজী তাঁর ঐহিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কল্যাণের কারণ বলে রাজার দৃঢ় প্রত্যয় হল । এই

গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ আজীবন অটুট ছিল, এবং উভয়ের জীবনেই এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছিল ।[৭]

আলাসিঙ্গা

১৮৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে স্বামীজী তাঁর পূর্বপরিচিত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পন্ডিচেরি থেকে মাদ্রাজে উপস্থিত হলেন । এর কিছুদিন আগেই তিনি কন্যাকুমারিকাতে ভারতের পুনরুজ্জীবনের পথ খুঁজতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন । যাইহোক মাদ্রাজে মন্মথবাবুর বাড়িতে থাকার সময় একেবারে প্রথম দিন থেকেই বারো-চোদ্দ জন শিক্ষিত যুবক তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে গুরু পদে বরণ করলেন । এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল । বয়সে স্বামীজীর চেয়ে মাত্র দুবছরের ছোট পেরুমল সেসময় মাদ্রাজের পাচ্চইপ্পাস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করছিলেন । স্বামীজির ব্যক্তিত্বে তিনি এতটাই আকৃষ্ট হলেন যে অচিরেই তিনি শিকাগোতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বধর্মমহাসভায় স্বামীজীর যোগদান সুনিশ্চিত করতে অর্থসংগ্রহের কাজে নেতৃত্ব দিতে আত্মনিয়োগ করলেন । শুধু স্বামীজীর পাশ্চাত্য গমনের আয়োজন করাই নয়, কালক্রমে দাক্ষিণাত্যে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সংগঠন ও প্রসারে তিনি তাঁর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও অনুগত সেবকরূপে দায়িত্ব পালন করেছিলেন ।[৮]

জামশেদজী টাটা

শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে স্বামীজী তখন জাহাজে চীন-জাপান হয়ে আমেরিকার পথে । ইয়োকোহামা থেকে ১৮৯৩-এর ১৪ই জুলাই তাঁদের জাহাজ এম্প্রেস্ অফ ইন্ডিয়া রওনা দিল ভ্যাঙ্কুবর । জাহাজে স্বামীজীর সঙ্গী ছিলেন জামশেদজী নসরভনজী টাটা । তিনি সেসময় জাপান থেকে দেশলাই আমদানী করে ভারতে ব্যবসা করতেন । স্বামীজী তাঁকে পরামর্শ দিলেন, 'জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশে বিক্রয় করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন ? তুমি তো সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মাত্র; এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে এবং দেশের টাকা দেশেই থাকবে'।□ শুধু তাই নয়, স্বামীজী তাঁকে ভারতে স্টীল প্ল্যান্ট তৈরি ও বিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি আধুনিক কেন্দ্র গড়ে তুলতেও উৎসাহ দেন । পরবর্তীকালে জামশেদজী আমেরিকা থেকে প্রযুক্তি এনে স্টীল প্ল্যান্টের কাজ শুরু করেন এবং একটি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রও গড়ে তোলেন । ১৮৯৮ সালে সেই গবেষণা কেন্দ্রে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি স্বামীজীকেই আহ্বান জানান । স্বামীজীর পক্ষে সেই দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব না হলেও সম্ভবতঃ তাঁরই আগ্রহে সেবছর 'প্রবুদ্ধ ভারতে' এই প্রতিষ্ঠানের সমর্থনে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ।[১০]

সূর্যের কিরণ-বিকিরণের অধিকার

১৮৯৩ সালের জুলাইয়ের শেষে বিবেকানন্দ আমেরিকায় পৌঁছে এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন । একে তো প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে তাঁর উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাব, সেই সঙ্গে প্রবল আর্থিক অনটন এবং নতুন আদব-কায়দা ও রীতি-নীতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম । তার সঙ্গে যুক্ত হল আরেক দুশ্চিন্তা – শিকাগো ধর্মমহাসভা শুরু হতে আরও দুমাস দেরি আর সেখানে বক্তৃতা দিতে প্রয়োজন উপযুক্ত সুপারিশ ও পরিচয়পত্র । এই পরিস্থিতিতে আগষ্টের শেষাশেষি তাঁর সঙ্গে আলাপ হল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের । স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর উপযুক্ত পরিচয়পত্রের অভাবে তাঁর ধর্মমহাসভায় যোগদানের সমস্যার কথা শুনে তিনি বললেন, 'আপনার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ বিকিরণের কি অধিকার আছে জিজ্ঞাসা করা একই কথা'। স্বামীজীর প্রতিভায় তিনি এত মুগ্ধ হলেন যে ধর্মমহাসভার সচিবের কাছে তাঁর সুপারিশপত্রে লিখলেন, 'ইনি এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে, আমাদের সব অধ্যাপককে একত্র করলেও তাঁরা এঁর সমকক্ষ হবেন না' ।[১১]

পৃথিবীর ভগবান --

অধ্যাপক রাইটের পর্যবেক্ষণ কতখানি নির্ভুল ছিল, তার প্রমাণ মেলে ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া থেকে । প্রত্যক্ষদর্শী এস কে ব্লজেট লিখেছিলেন, সেই যুবকটি উঠে যখন বললেন, 'আমার আমেরিকাবাসী বোন ও ভাইরা', তখন সাত হাজার নরনারী এমন একটা কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উঠে দাঁড়াল যা তারা ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ ছিল না । যখন বক্তৃতা শেষ হল, তখন দেখলাম, দলে দলে নারীরা তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য বেঞ্চি ডিঙ্গিয়ে অগ্রসর হচ্ছে । আমি তখন মনে মনে বললাম, এ আক্রমণে যদি তুমি মাথা ঠিক রাখতে পার তো তুমি ভগবান'![১২] স্বামীজী মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিলেন । সে রাতেই ধনীগৃহের বিলাসব্যসন ত্যাগ করে ভূমিশয্যায় নয়নজলে ভেসে তিনি জগন্মাতার কাছে কাতরে প্রার্থনা করেছিলেন, 'ভারতে জনতাকে কে ওঠাবে ? কে তাদের মুখে অন্ন দেবে ? মা দেখিয়ে দাও, আমি কি করে তাদের সেবা করতে পারি'।[১৩] এর অনেক পরে ১৮৯৮ সালের মাঝামাঝি একবার জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে শ্রীমতী ব্লজেটের পরিচয় হয় । ব্লজেটের বাড়িতে ম্যাকলাউডের অসুস্থ ভাই তখন ভাড়া থাকতেন । ভাইয়ের রোগশয্যার ওপর স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব এক ছবি দেখে ম্যাকলাউড শ্রীমতী ব্লজেটকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি তাঁকে চেনেন কি না । বৃদ্ধা ব্লজেট তখন শ্রদ্ধানত চিত্তে উত্তর দিলেন, 'পৃথিবীতে যদি কোন ভগবান থাকেন, তবে ইনিই' । পরে স্বামীজী তাঁর আমন্ত্রণে লস এঞ্জেলেসে তাঁর বাড়িতে এসে ক্লাস নিয়েছিলেন ।[১৪]

বাছা, শান্ত হও

শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্যের সুবাদে বিবেকানন্দ তখন আমেরিকার অভিজাত মহলে সুপরিচিত নাম । ১৮৯৪ সালের মার্চে শিকাগোতে থাকাকালীনই একদিন বিখ্যাত অপেরা গায়িকা মাদাম এমা কালভে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন । কালভে তখন ব্যক্তিগত জীবনে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছিলেন । তাঁর একমাত্র মেয়ের আকস্মিক প্রয়াণ তাঁকে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল । চারবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে বিফল হয়ে, শেষে যেন দৈবনির্দেশেই তিনি স্বামীজীর কাছে উপনীত হলেন । প্রথম সাক্ষাতের সেই পরমক্ষণটি তাঁর স্মৃতিতে চিরভাস্বর হয়ে ছিল । তিনি লিখেছেন, 'আমি ঘরে ঢুকে ক্ষণমাত্র চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম । তখন তিনি শান্তভাবে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । তাঁর গেরুয়া রঙের পোশাক সোজা মেঝে পর্যন্ত ঝুলে ছিল, মাথায় ছিল পাগড়ি এবং তা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে ছিল । তাঁর চোখ ছিল নিম্নদৃষ্টি । একটু পরেই তিনি চোখ না তুলেই বললেন, "বাছা, কি ঝড়ো আবহাওয়াই না তুমি নিয়ে এলে ! শান্ত হও, এটা একান্ত আবশ্যক ।"

এরপর স্বামীজী একের পর এক কালভের ব্যক্তিগত জীবনের নানা অতীত ঘটনা বলে যেতে লাগলেন । কালভে যখন জিজ্ঞাসা করলেন এসব কথা কে তাঁকে বলেছেন, স্বামীজী জানালেন তার কোন প্রয়োজন নেই কারণ, 'আমি খোলা বইয়ের মতোই তোমার ভেতরটা পড়তে পারি'। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে কালভের জীবন বদলে গেল । স্বামীজী তাঁকে বললেন, 'তোমাকে সব ভুলে যেতে হবে । আবার খুশী ও সুখী হও, শরীরটা সুস্থ কর । চুপ করে বসে শুধু দুঃখের কথা ভেবো না । তোমার অন্তরের ভাবাবেগকে বাইরে কোন একটা রূপ দাও'--- ।[১৫] কালভে লিখেছেন, 'তাঁর সুদৃঢ় ইচ্ছা-প্রভাবে আমি আবার প্রাণবতী ও আনন্দপরিপূর্ণা হয়ে উঠলাম'। পরবর্তীকালে কালভের সঙ্গে স্বামীজী মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন । সেসময় কালভে আরও ঘনিষ্ঠভাবে স্বামীজীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান । একবার তিনি বেলুড় মঠেও এসেছিলেন ।

ধন্যবাদ তো আমাকে দেওয়া উচিত

প্রায় একই সময়ে আমেরিকান ধনকুবের জন ডি রকফেলারের জীবনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেন স্বামীজী । স্বামীজী সেসময় রকফেলারের এক পরিচিতের বাড়িতে থাকতেন । রকফেলার আগে বার কয়েক সুযোগ পেলেও স্বামীজির সাক্ষাৎ এড়িয়ে গিয়েছিলেন । তিনি বেশ স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন, কারও উপদেশ শুনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন না । কিন্তু হঠাৎ একদিন কোনও আগাম খবর না দিয়েই রকফেলার স্বামীজীর পাঠকক্ষে ঢুকে পড়লেন । দেখলেন স্বামীজী কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের পড়ার টেবিলের পেছনে বসে আছেন তারপর তিনি একে একে রকফেলারের জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত কথা ধীরে ধীরে বলে গেলেন । আর বললেন যে, ভগবান তাঁকে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য ধন দিয়েছেন, তিনি যেন স্বার্থবুদ্ধি পরিত্যাগ করে অছি-জ্ঞানে সেই সম্পদের সদ্ব্যবহার করেন । এতে রকফেলার আরও রেগে গেলেন । যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিলেন, তেমনি করেই চলে গেলেন, কোনও বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই । কিছুদিন পরে রকফেলার আবার ফিরে এসে স্বামীজীর সামনে টেবিলের ওপর একটা কাগজ ছুঁড়ে দিলেন, যাতে লেখা ছিল রকফেলার জনকল্যাণে নিবেদিত এক সংস্থা গড়েছেন এবং এর জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করবেন মনস্থ করেছেন । স্বামীজীর কোনও প্রতিক্রিয়া না দেখে তিনি নিজেই বললেন, 'এই নিন মশায়, এখন আপনার সন্তোষ হবে, আর এর জন্য আপনি আমায় ধন্যবাদ দিতে পারেন'। কাগজটি পড়ে স্বামীজী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'ধন্যবাদ তো আপনারই আমাকে দেওয়া উচিত'। ভবিষ্যতে রকফেলার আমেরিকার অন্যতম সেরা ধনী এবং একই সঙ্গে জনসেবায় অগ্রণী দাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন, আর এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই তার সূত্রপাত হয়েছিল ।[১৬]

যা কিছু তিনি বলেছেন, সবই অভ্রান্ত

১৮৯৫-এর ২৯শে জানুয়ারি নিউইয়র্কের একটি বাড়িতে মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দেখেন । স্মৃতিকথায় ম্যাকলাউড লেখেন, 'তিনি প্রথম যে কথাটি বললেন, তা এখন আমার মনে নেই; কিন্তু তা তখন আমার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলেই প্রতীত হয়েছিল । তিনি যে দ্বিতীয় কথাটি বললেন, তাও ছিল সত্য, আর তেমনি সত্য ছিল তৃতীয় কথাটি । তারপর সাত বছর ধরে আমি তাঁর কথা শুনেছি এবং যা কিছু তিনি বলেছেন, সবই আমার কাছে ছিল অভ্রান্ত' । তিনি আরও লিখেছিলেন, 'সেদিন থেকে আমার কাছে জীবনের অর্থ অন্যরকম হয়ে গেল । মনে হত, তিনি অপরের মধ্যে এমন এক অনুভূতি জাগিয়ে দিতেন যেন সে অসীমের মধ্যে বাস করছে । সে অসীমতার কোন পরিবর্তন হত না, কোন বৃদ্ধিও তাতে ছিল না । সূর্যকে একবার দেখলে যেমন আর কখনও ভোলা যায় না, এ যেন ঠিক তারই মতো'।[১৭] সত্যিই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ম্যাকলাউড তা ভোলেন নি । স্বামীজীর কাজে যাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়, সেজন্য তিনি সবসময় নিজের কাছে কিছু টাকা আর একটা ট্রেনের টিকিট মজুত রাখতেন !

রাফেলের তুলিতে চিত্রিত যীশুখ্রীষ্ট

১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে স্বামীজী লন্ডনে পৌঁছন । নভেম্বর মাসে এক সন্ধ্যায় সেখানেই ইসাবেল মার্গেসনের বাড়িতে ঘরোয়া এক আলোচনাসভায় মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল, ভাবীকালের ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে প্রথম দর্শন করেন । সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'তিনি আমাদের মধ্যে তাঁর লাল রঙের আলখাল্লা ও কোমরবন্ধ পরে বসে যেন কোন সুদূর দেশের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন ও মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত অভ্যাসবশে বলছিলেন, 'শিব, শিব'। তাঁর আননে ছিল কোমলতা ও উচ্চভাবের এমন এক মধুর সমাবেশ যা ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিদের বদনে ফুটে ওঠে ---এ যেন সেই মুখচ্ছবি যা মেরী-ক্রোড়ে উপবিষ্ট যীশুখ্রীষ্টের মুখে রাফেলের তুলিতে চিত্রিত হয়েছে । সে অপরাহ্নের পর দশ বছর কেটে গেছে । কিন্তু সেদিন তিনি যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি আবৃত্তি করেছিলেন, তা কোনদিন ভোলার নয়' –।[১৮] প্রথম দর্শনে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হলেও, তাঁর সব বক্তব্যকে পুরোপুরি মেনে নিতে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন । ১৮৯৬ সালে স্বামীজী দ্বিতীয় বার লন্ডনে এলে মার্গারেট নিয়মিত তাঁর ক্লাসে যোগদান শুরু করলেন । একদিন প্রশ্নোত্তর ক্লাসে স্বামীজী হঠাৎ বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠলেন, 'জগৎ আজকের দিনে যা চায়, তা হচ্ছে এমন বিশজন নরনারী যারা ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাহসভরে বলতে পারবে যে, ভগবান ছাড়া তাদের আপনার বলবার আর কেউ নেই । কে প্রস্তুত' ? এবার নিবেদিতার প্রাণ সাড়া দিল । তিনি স্বামীজীর কাছে তাঁর কর্মপরিকল্পনা জানতে চাইলেন । ১৮৯৬-এর জুন মাসে স্বামীজী তাঁকে লিখলেন, 'হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো ! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে – তোমার কি নিদ্রা সাজে'?[১৯] নিবেদিতা এবার সর্বান্তঃকরণে স্বামীজীর কর্মযজ্ঞে আত্মনিবেদন করলেন ।

সেরা ভ্রমণসঙ্গী

প্রায় একই সময়ে স্বামীজীর ক্লাসে যোগ দিতে এলেন ক্যাপ্টেন জন হেনরি সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী শার্লোট সেভিয়ার । স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাতে ও তাঁর মুখে বেদান্ত দর্শনের কথা শুনে তাঁদের মনে হল, 'এই ব্যক্তি ও এই দর্শনের অন্বেষণেই তো আমরা এযাবৎ জীবনযাপন করেছি অথচ সফলকাম হই নি'।[২০] এরপর তাঁরা দুজনে একান্তে স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হলেন । সেদিনই শ্রীমতী সেভিয়ারকে স্বামীজী 'মা' বলে সম্বোধন করে একাধারে গুরু ও পুত্ররূপে তাঁদের চিত্ত জয় করে নিলেন । আলাপের মাত্র দুমাসের মাথায় সেভিয়ার দম্পতি স্বামীজীর সঙ্গে ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণে বের হলেন । এই ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরে শ্রীমতী সেভিয়ার লিখেছিলেন, 'মানুষের ক্রিয়াকলাপের সকল ক্ষেত্র, ও জ্ঞানের সকল শাখা স্বামীজীর আগ্রহের বিষয় ছিল, আর তাঁর মানসিক প্রফুল্লতা ও ঔদার্য, সেই সঙ্গে তাঁর সুক্ষ্মবুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, সবকিছু মিলিয়ে তাঁকে এক অত্যন্ত আনন্দদায়ক সেরা ভ্রমণসঙ্গী করে তুলেছিল'।[২১] স্বামীজীর অমোঘ আকর্ষণে এর এক বছরের মধ্যেই সেভিয়ার দম্পতি তাঁদের সব সম্পত্তি বিক্রি করে তাঁর সঙ্গে ভারতে চলে এলেন । ১৮৯৯ সালে তাঁদেরই নিঃস্বার্থ সেবা ও দানে হিমালয়ের মায়াবতীতে বাস্তব রূপ নিল স্বামীজীর স্বপ্নের 'অদ্বৈত আশ্রম'।

মাই ফেইথফুল গুডউইন

১৮৯৫-এর শেষ এবং ১৮৯৬-এর শুরুর দিকে নিউইয়র্কে স্বামীজী নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছিলেন । তাঁর অনুগামীরা সেসময় সেইসব বক্তৃতা সংকলনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন । কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতার তোড় শর্টহ্যান্ডে লিপিবদ্ধ করার উপযুক্ত লোক পাওয়া মুশকিল হল । একে একে দুজন বাতিল হলেন ।

অবশেষে এক বৃটিশ তরুণ জোশিয়া জে, গুডউইন এই কাজে নিযুক্ত হলেন । স্বভাবে তিনি বেশ বোহেমিয়ান ছিলেন । কিন্তু দক্ষতা ও কাজের প্রতি নিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় । মাত্র ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ ঘুরে প্রায় তিনটি সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেছিলেন এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসেছিলেন । কিন্তু কোথাও তিনি যথার্থ স্নেহ-ভালবাসা-মর্যাদা পান নি । অচিরেই স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও স্নেহস্পর্শে তিনি যে কেবল তাঁর বক্তৃতার হ্রস্বলিপিকারের কাজ করতে থাকলেন তাই নয়, একাধারে স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য, সচিব এবং বেদান্ত প্রচারে নিবেদিত কর্মী হয়ে উঠলেন । যে কাজের জন্য একজন পেশাদার স্টেনোগ্রাফারকে সেসময় সপ্তাহে অন্ততঃ পনের ডলার পারিশ্রমিক দিতে হত, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানের জন্য সামান্য অর্থ ছাড়া গুডউইন সেজন্য প্রায় কিছুই নিতে চাইতেন না । বলতেন, 'বিবেকানন্দ যদি জীবন দিয়ে দিতে পারেন, আমি অন্ততঃ আমার সেবাটুকু দিতে পারি ।"[২২] স্বামীজী স্নেহভরে তাঁর নাম দেন –'মাই ফেইথফুল গুডউইন' । স্বামীজীর রচনার অধিকাংশ লিপিবদ্ধ করার কৃতিত্ব তাঁরই ।

এক প্রণামেই হৃদয় হরণ

১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা – ইউরোপে বেদান্ত প্রচার করে কলকাতায় ঘরের মাটিতে পা দিয়েছেন । বজবজে জাহাজে এসে সেখান থেকে ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশন । সেখান থেকে যে গাড়িতে স্বামীজী উঠলেন তার ঘোড়াগুলি খুলে নিয়ে উৎসাহী যুবকেরা নিজেরাই টানতে লাগলো । দিকে দিকে খোল-করতাল-কীর্তন সহযোগে জয়ধ্বনি উঠল, 'জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কী জয়' । সেই অত্যুৎসাহী জনজোয়ারের সাক্ষী ছিলেন তীক্ষ্ণধী যুবক সুধীর চক্রবর্তী । তিনি লিখেছেন, 'স্বামীজী যে গাড়িখানিতে ছিলেন, ঠিক তার সম্মুখেই দাঁড়িয়েছিলাম । যেই গাড়ি থামল, দেখলাম স্বামীজী দাঁড়িয়ে সমবেত সকলকে করজোড়ে প্রণাম করলেন । এই এক প্রণামেই স্বামীজী আমার হৃদয় আকর্ষণ করলেন'।[২২] আর এই আকর্ষণই তাঁকে টেনে আনল স্বামীজীর শরণে । স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হয়ে সুধীর হলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ, পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্ঘাধ্যক্ষ ।

এল, দেখল, পরাজিত হলো

এইভাবে দেশে-বিদেশে স্ত্রী পুরুষ, ধনী নির্ধন, জাতি-ধর্ম-ভাষা-বৃত্তি নির্বিশেষে যিনিই স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁর জীবন বদলে গেছে । বদলে গেছে দুই অর্থে –এক, তাঁরা অন্তরের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সাধারণ থেকে অ-সাধারণ হয়ে উঠেছেন; আর দুই, তাঁরা অনেকেই স্বামীজীর আত্মমুক্তি ও জগদ্ধিতরূপ জীবনব্রত উদ্‌যাপনে আত্মোৎসর্গ করেছেন । এখানে সেরকমই কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা হল, অনুল্লিখিত থেকে গেল অধিকাংশের কথা । কিন্তু এই ক'টি ঘটনা থেকেই এটা স্পষ্ট স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের অমোঘ আকর্ষণ এড়ানো অসম্ভব ছিল । মাদ্রাজের এক অজ্ঞেয়বাদী বিজ্ঞানের অধ্যাপক সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র স্বামীজীর সঙ্গে একবার তর্ক করতে এসেছিলেন । কিন্তু অচিরেই তিনি স্বামীজীর যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী কথা আর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁর ভক্ত হয়ে উঠলেন । স্বামীজী তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'কিডি' । কিডির এই রূপান্তরকে উল্লেখ করে স্বামীজী ঠাট্টা করে বলতেন, 'সিজার বলেছিলেন, এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'! কিন্তু কিডি এল, দেখল, পরাজিত হলো'![২৪] এই কথা স্বামীজীর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন, মনে হয় তাঁদের সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।

মরা মানুষ লাফিয়ে ওঠে

তবে স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন শুধু কি তাঁরাই তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন ? না, তা নয় । স্বামীজী বলেছিলেন তাঁর শরীর চলে গেলেও তাঁর অশরীরী বাণী মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবে । তাই দেখি তাঁর মহাসমাধির পরও শত-সহস্র মানুষ সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর বাণীমূর্তির সংস্পর্শে এসে জীবনের নতুন ও মহত্তর অর্থ আবিষ্কার করেছেন । বিংশ শতকে ভারতীয় সমাজের জননায়কদের মধ্যে -- সুভাষ চন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, বিনোবা ভাবে –এঁরা সকলেই স্বীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন । সেরকমই স্বীকৃতি জানিয়েছেন বহির্বিশ্বের বহু শ্রুতকীর্তি ব্যক্তিত্ব । যেমন –লিও টলস্টয়, রোমাঁ রোলাঁ, অল্ডাস হাক্সলি, ক্রিস্টোফার ইশারউড, ই পি চেলিশেভ প্রমুখ । আর আজ স্বামীজীর জন্মের দেড়শ বছর পর মানুষ তাঁকে কীভাবে দেখছে ? একটা দৃষ্টান্ত দিলে ছবিটা স্পষ্ট হবে ।

১৯৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধের কয়েক বছর পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক তরুণ জওয়ান জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবছিলেন । এমন সময় একদিন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের এক বইয়ের

স্টল থেকে তিনি একটি বই কিনলেন । মলাটে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি আর ভেতরে দেশের যুবকদের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর জ্বালাময়ী বাণী । তরুণটি জীবনের এক নতুন অর্থ খুঁজে পেলেন । শুরু হল এক নতুন সংগ্রাম । মহারাষ্ট্রের খরাপীড়িত রালেগাঁও সিদ্ধি গ্রামে সবুজবিপ্লবের জোয়ার আনা দিয়ে যার সূত্রপাত; আজ তা ভারতজুড়ে দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃহত্তর নাগরিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে । সেদিনের সেই তরুণ জওয়ানই হলেন আজকের তরুণদের 'আইকন' বরেণ্য জননেতা অন্না হাজারে । আর হাজারে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন স্বামীজীর অগ্নিময়ী ব্যক্তিত্ব আর প্রাণস্পর্শী বাণীই তাঁর প্রেরণার উৎসমুখ ।[২৫]

প্রশ্ন জাগে, কী ছিল স্বামীজীর কথায় যা আজও মানুষকে প্রেরণা যোগাচ্ছে ? স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দের কথায় এর উত্তর পাওয়া যাবে । স্বামীজীর কথার শক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'স্বামীজীর কথা শুনলে মরা মানুষ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বলত –"দাঁড়াও দাঁড়াও ! মরে তো গেছি, কথাটা একবার শুনে যাই ।" তাঁর কথার এতই জোর ছিল যে, ভাব ও ভাষা হৃদয়ের অন্তঃস্তলে তখনই পৌঁছত, একটুও বিলম্ব হতো না । সময়ের ভুল হয়ে যেত । লোকে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেত । সকলের মনকে এক উচ্চ ভাবভূমিতে তিনি তুলে দিতে পারতেন'।[২৬] আর এই উচ্চভূমিতে পৌঁছে মানুষ যাবতীয় ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা মলিনতা দূরে সরিয়ে এক অনাবিল অন্তর্নিহিত বিরাট সত্তার সন্ধান পায় । মানুষ 'মহারথী' হয়ে যায় । স্বামীজী তো তাই চেয়েছিলেন । ১৮৯০ সালে দ্বিতীয়বার প্রব্রজ্যায় বেরনোর আগে তিনি মঠের গুরুভাইদের বলেছিলেন, 'এবার আর স্পর্শমাত্র লোককে বদলে ফেলতে পারার ক্ষমতালাভ না করে ফিরছি না'।[২৭] বলাবাহুল্য স্বামীজীর জীবনদেবতা তাঁর সেই ইচ্ছাপূরণ করেছিলেন—তার প্রমাণ আজও অবিরল । ■

তথ্যসূত্র

[১] স্বামী গম্ভীরানন্দ, যুগনায়ক বিবেকানন্দ (এরপর থেকে যুগনায়ক), ১৯৯৯, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১:৯৪

[২] শ্রীম কথিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (এরপর থেকে কথামৃত)অখণ্ড, ১৯৯০, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২২।০২।১৮৮৫, ৯৭১

[৩] কথামৃত, ১৫।০৭।১৮৮৫,৮০৯

[৪] কথামৃত, ০৮।০৫।১৮৮৭, ১০১৩

[৫] স্বামী অন্নদানন্দ, স্বামী অখন্ডানন্দ, ১৯৮২, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৬৫

[৬] স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পাদক), স্মৃতির আলোয় স্বামীজী (এরপর থেকে স্মৃতির আলোয়), ১৯৯৩, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২৯-৩০, যুগনায়ক, ১:১৯৯-২০১

[৭] যুগনায়ক, ১:২৬২-৭

[৮] যুগনায়ক, ১:৩২৯-৪২

[৯] মহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১৯৮৯, দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলকাতা ৩:২

[১০] Swami Medhasananda, 'Pioneering the Indo-Japanese Relationship', Anjali, Durgapuja 2007

[১১] যুগনায়ক, ২:১৪

[১২] যুগনায়ক, ২:২৭

[১৩] যুগনায়ক, ২:২৭

[১৪] স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদক), চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ (এরপর থেকে চিন্তানায়ক), ১৯৮৮, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিট্যুট অফ কালচার, কলকাতা ৯৫১-২

[১৫] যুগনায়ক, ২:৫১-২

[১৬] যুগনায়ক, ২:৫৩-৪

[১৭] যুগনায়ক, ২:১৫৫

[১৮] যুগনায়ক, ২:১৮৯

[১৯] যুগনায়ক, ২:২৪৮

[২০] যুগনায়ক, ২:২৪৯

[২১] Music Louise Burke, Swami Vivekananda in America: New Discoveries, 1988 Advaita Ashrama, Mayavati, 4:280 (থেকে স্বকৃত অনুবাদ)

[২২] চিন্তানায়ক, ৯৪৭

[২৩] স্মৃতির আলোয় ৩১

[২৪] যুগনায়ক, ২:৩২৫

[২৫] দ্রষ্টব্য : http://www.annahazare.org/biography.html

[২৬] স্মৃতির আলোয়, ১০

[২৭] যুগনায়ক, ১:২২২

মানব প্রেমিক বিবেকানন্দ - সূর্যের এক নাম

- সৌরভ চৌধুরী

(বেলুড় বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী ও বর্তমানে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্-এ কর্মরত)

অঙ্কের হিসেবে ক্ষণকাল (১৮৬৩—১৯০২) তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে । কিন্তু অঙ্কের বাইরে একটা হিসেব আছে, তার নিরিখে তিনি জীবিত থাকবেন সহস্র বৎসর ধরে আমাদের মনে এবং চেতনায় । সাহিত্যিক বনফুল স্বামীজী উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে লিখেছেন, "এ অগ্নি আমাদের স্পর্শ কর তুমি । অঙ্গার হয়ে কতকাল থাকবো আমরা জড়ের মতো । আমাদের প্রাণবান কর, শক্তিমান কর, উজ্জ্বল কর, মহৎ কর । মুক্ত কর আমাদের হীন-পশুত্বের কারাগার থেকে । আমরা আজও তোতাপাখীর মতো তোমার বন্দনা করে যাচ্ছি, হৃদয়ের মধ্যে তোমাকে অনুভব করিনি । আমাদের প্রতি দয়া কর । হে ধন্বন্তরি, দূর কর আমাদের অন্ধকার । আমাদের প্রেরণা দাও, আমাদের বাঁচাও ।"

এই অগ্নিদেবতা বিবেকানন্দের কাছে মানুষই ছিল প্রথম এবং মানুষই হল শেষ কথা । মানুষের সুপ্ত আত্মার জাগরণে, মানুষের হৃদয়ের দেবত্বকে জাগরিত করতে সারাটা জীবন তাঁর সংগ্রাম । বিশ্বাস করেছেন ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমেই জাতির উন্নতি । স্বদেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে মহামন্ত্র শুনিয়েছেন, "শ্রদ্ধাবান হও, বীর্যবান হও । আত্মজ্ঞান লাভ কর, পরহিতায় জীবনপাত কর এবং মানুষকে ভালবাস ।" স্বামীজী নিজের চোখে দেখেছেন মানুষের প্রতি এক জমাট বাঁধা ভালবাসা তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে । তাই বিবেকানন্দ, শুষ্ক তার্কিক ধার্মিক নেতা হননি, হয়েছেন হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক । মানবসাধারণের দুঃখে চোখের জল ফেলেছেন এই প্রেমিক সন্ন্যাসী । দেশের দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশায় ঘুমোতে পারেন নি । মানুষের বেদনায় তাঁর মন করেছে ছটফট । বলতেন "যে যত দুর্বল তাকে তত সাহায্য কর ।"

ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, "যে মুহূর্তে আমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহূর্ত হইতে তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে এক অগ্নির নিরন্তর দহনজ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি, সে কোন তত্ত্ব, কোন আধ্যাত্মিক উপাসনা বা উন্মাদনা নয়, দেশ ও জাতির দুর্দশা নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস ও তাহার নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনা ভোগ ।"

স্বামীজীর শিষ্যা ভগিনী ক্রিষ্টিন বলেছেন, "তিনি যখন INDIA কথাটি উচ্চারণ করতেন, তার মধ্যে এত গর্ব, এত ভালবাসা, এত স্বপ্ন ফুটে উঠত যে সেও ভারতবর্ষকে ভালবেসে ফেলত ।" স্বামীজি নিজেই একবার নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "I am condensed India—ভারতবর্ষের ঘনীভূত রূপ । এক শোষণহীন, বঞ্চনাহীন ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন স্বামীজী । স্বামীজী ভারতবর্ষকে ভালবাসতেন তার আদর্শের জন্য । তিনি বলতেন, "ভারত কি মরে যাবে ? তাহলে জগত থেকে সমস্ত আধ্যাত্মিকতা দূর হয়ে যাবে । সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ বিলুপ্ত হবে – তার জায়গায় দেবদেবী রূপে যৌথ রাজত্ব চালাবে কাম ও বিলাসিতা ।"

বিবেকানন্দের কথায়, "জাপানে শুনেছি সে দেশের বালিকাদের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হবে । আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেহ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদ বিচলিত চির-বুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগবে । যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাস সকল ভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করে কায়মনোবাক্যে দারিদ্র, মূর্খতার ঘূর্ণাবর্তে ক্রমশ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করবে, তখন ভারত জাগবে । --- সদুদ্দেশ্য, অকপটতা ও অনন্ত প্রেম বিশ্ববিজয় করতে সক্ষম, উক্ত গুণশীল একজন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্বুদ্ধির নাশ করতে সক্ষম ।"

জানুয়ারী ১৯৬৩ সাল । সারা ভারত জুড়ে পালিত হচ্ছে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী । তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান কলকাতায় এসেছিলেন । শতবার্ষিকী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আজ আমরা এক মহা সংকটের সম্মুখীন । সমাজের মূল্যবোধ বিকৃত, জীবনের নৈতিক মান অবনমিত । সর্বগ্রাসী নৈরাশ্যবাদ ও সর্বজনীন উন্মত্ততায় আমরা আক্রান্ত, হতাশায় উদ্‌ভ্রান্ত, পরাজয়ে আমরা অধঃপতিত । কিন্তু মানুষের আত্মার প্রতি এই অবিশ্বাস হল মানুষের মর্যাদার প্রতি ঘৃণ্য বিশ্বাঘাতকতা । যদি বিবেকানন্দের কোন বাণী আমাদের স্মরণ করতে হয় তাহা হইল আমাদের আত্মিক মহিমার প্রতি নির্ভরতার আহ্বান, মানুষের মধ্যে অনন্ত আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা নিহিত আছে । মানুষের আত্মাই সর্বোচ্চ, মানুষ অদ্বিতীয়, অপূর্ব – শুধু আমাদের আশা রাখিতে হবে । বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছেন, দুঃখের মধ্যে দিয়েছেন আশা, নৈরাশ্যের মধ্যে সাহস ।"

স্বদেশের কল্যাণ – বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে ধরা পড়েছে সর্বাধিক । "ভারত আবার উঠবে, জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে । বিনাশের বিজয়পতাকা নিয়ে নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা নিয়ে সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ সহায়ে ।"

বিবেকানন্দ আমাদের ভয়শূন্য হতে বলেছেন । সামাজিক, সাংস্কৃতিক সত্তার বিকাশ চেয়েছেন । আধুনিক বিবেকানন্দ মনুষ্যজাতিকে এক নূতন ধর্মচেতনা দিয়ে গেলেন সে ধর্ম সব মানুষকে নিয়ে এক মানব জাতির ধর্ম, মানব সর্বস্বতার ধর্ম । এই হল দরিদ্র ভারতবর্ষের একটি বড় ঐশ্বর্য । তিনি ভেবেছেন পৃথিবীর মানুষের দুঃখের কথা । চেয়েছেন মানুষ গ্লানিমুক্ত হোক । বলেছেন নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথরের জীবন পূর্ণ অধিকারে ফিরে আসুক ।

ইউরোপ ও আমেরিকার নারী সমাজ তাঁকে মুগ্ধ করেছে । নারী সেখানে পুরুষের সাথে সমান অধিকার অর্জন করেছে । এই নারীকে তিনি ভারতবর্ষে দেখতে চেয়েছেন । পাশ্চাত্যের মানুষ ক্ষমতা ও টাকার কাছে পরাজিত । সেখানে মানুষ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার শিকার হয়েছে । কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে মানুষ প্রধান । প্রতিষ্ঠান গৌণ । যন্ত্র যতই ভাল হোক সে যন্ত্র । মানুষ মানুষের যন্ত্র নয় । মানুষ নিজে চর্চা করে, কষ্ট করে – দুঃখ পেয়ে মানুষ বড় হয় । এই বড় মানুষ তৈরির সাধনাই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের একমাত্র সাধনা ।

শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী তাঁর হিন্দুধর্ম বিষয়ক ভাষণে বিশ্বমানবকে শোনালেন নূতন কথা । বললেন, "মর্ত্য ভূমির দেবতা তোমরা ! তোমরা পাপী ? মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ ।" Ernest Hawking (প্রখ্যাত দার্শনিক) তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, "বিবেকানন্দ যখন বললেন "মানুষকে পাপী বলাই মহাপাপ, তখন সমস্ত শ্রোতা যেন বজ্রাহত হয়ে গেল । এইরূপ অপূর্ব, অসম্ভব কথা তাঁরা কখনো শোনেন নি । বস্তুত বিবেকানন্দ সেদিন মানুষকে শুনিয়েছিলেন নূতন আশা ও আশ্বাসের বাণী । জাগিয়ে তুলেছিলেন মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে ।

ধর্ম মহাসভার শেষ দিনে (২৭শে সেপ্টেম্বর) স্বামীজী মন্ত্রমুগ্ধ বিশ্বহৃদয়কে শোনালেন এক নূতন জীবন সত্য । ঘোষণা করলেন ধর্মান্ধতার ও ধর্ম-উন্মত্ততার বিরুদ্ধে এক প্রকাশ্য জেহাদ । বললেন, "আমি কি ইচ্ছে করি যে খ্রীষ্টান হিন্দু হোক । ঈশ্বর না করুন । আমার কি ইচ্ছে যে কোন হিন্দু বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান হোক । ভগবান যেন তা না করেন ।" তিনি ঘোষণা করলেন ধর্মান্তরিতকরনের মাধ্যমে বিশ্ব কোন দিনও ধর্মীয় ঐক্য স্থাপনে পৌঁছাতে পারে না । বরং বিবাদ নয় – সহায়তা । বিনাশ নয় -- পরস্পরের ভাবগ্রহণ, মতবিরোধ নয় – সমন্বয় ও শান্তি। যথার্থই বলেছেন ---

"I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance but we accept all religions are true."

তিনি অগ্নিময় ভাষায় তাই বলেছেন পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ । শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ । ঘোষণা করলেন, "ক্ষুধার যাতনায় কোটি কোটি ভারতবাসী কাতর কণ্ঠে শুধু খাদ্য চায় । কিন্তু আমরা শুধু তাদের পাথরের টুকরো দিই । ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের বাণী দেওয়া তাকে অপমান করা । অনাহারীকে দর্শন শাস্ত্র শেখানো তাকে অসম্মান করা ।" খরা, বন্যা, মহামারী, অর্ধাহার-অনাহারে যন্ত্রণাকাতর ভারতের সর্বহারাদের স্মরণ রেখে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, "নূতন ভারত বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে । বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে ।"

স্বামীজী বলেছেন, "নেতা হইতে যাইও না ।" তাঁর আহ্বান, "তুমি কর্মী হও, মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করো এবং কখনো ভেবো না যে, মানুষের জন্য কিছু কাজ করে তুমি তাকে উদ্ধার করে দিয়েছ ।"

আমাদের সতর্ক করে বলেছেন,

"Our duty to others means helping others; doing good to the world, but really to help ourselves------ Do not stand on a high pedestal and take five cents in your hand and say, "Here, my poor man! but be grateful that the poor man is there, so that by making a gift to them, you are able to help yourself."

মানবতার প্রতি এই আকাশ ছোঁয়া শ্রদ্ধার জন্যেই বজ্রগর্জিত কণ্ঠে তাঁকে বলতে শোনা গেছে, "Never forget the glory of human nature !" We are the greatest God, Christ and Buddha are but waves of the boundless ocean, which I am".

মানুষের ওপর এত গভীর আস্থা ছিল বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, "---man never progresses from error to truth, but from truth to truth, from lesser truth to higher truth".

স্বামীজীর ভালবাসা সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের অনায়াস ফল । এইরূপ এক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন জোসেফিন ম্যাকলাউড । একদিন স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা কায়রো শহরে পথ হারিয়েছেন । ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এসে হাজির হলেন এক ছোট এঁদো গলিতে যার আশেপাশের বাড়ির জানালা বা সিঁড়িতে অর্ধনগ্ন মহিলারা বসে অঙ্গভঙ্গি করছিলেন । স্বামীজীর চোখে এইসব কিছুই পড়েনি । হঠাৎ একদল প্রগল্‌ভ মহিলা তাঁকে ইঙ্গিত করে হাসতে লাগল । স্বামীজীর দলের জনৈক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি স্বামীজীকে অন্যত্র নিয়ে যেতে চাইলেন । কিন্তু স্বামীজী ধীরে ধীরে দল থেকে সরে এসে বেঞ্চে বসা সেই প্রগল্‌ভ মহিলাদের দিকে এগিয়ে গেলেন । তারপর বললেন, "আহা বাছারা ! বেচারিরা তাদের দেবত্বকে সৌন্দর্য্যের কাছে সমর্পণ করেছে । এখন তাদের কী দুর্দ্দশা !" এই বলে কেঁদে ফেললেন । সেই প্রগল্‌ভ মহিলাদের দল নিশ্চুপ ও লজ্জিত । তাদের মধ্যে একজন সামনে ঝুঁকে বিবেকানন্দের পোশাকের প্রান্ত স্পর্শ করে চুম্বন করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্প্যানিশে বলে উঠল, "ইনি ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ !"

আর একবার স্বামীজী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন, "হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না ।" বলতে বলতে স্বামীজীর মুখে গভীর বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল । নিজের বুকের ওপর হাত রেখে তিনি বললেন, "কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় বেদনা বোধ করতে শিখেছি । বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে ।" স্বামীজীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো । তুরীয়ানন্দ স্তম্ভিত ।

একবার কেউ স্বামীজীর কাছে জানতে চেয়েছিল কন্যাকুমারীর শিলার উপর বসে ধ্যান করে তিনি কি পেয়েছিলেন ? উত্তরে সেই সুদূর আমেরিকা থেকে লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের শেষ পাথরের টুকরোর উপর বসে এই যে আমরা এত জন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে দর্শন শিক্ষা দিচ্ছি, -- এই সব পাগলামি । ---- আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, তাই এত দুঃখ কষ্ট । সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে । নীচ জাতিকে উপরে তুলতে হবে ।"

জীবনের শেষ দিকে ১৯০২ সালে বেলুর মঠের আঙিনায় স্বামীজী সাঁওতাল মজুরদের নারায়নজ্ঞানে খাওয়ালেন যত্ন নিয়ে । তারপর এক শিষ্যকে বললেন, এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ । এমন সরল চিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা ---এমন আর দেখিনি । তারপর মঠের সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, "দেখ, এরা কেমন সরল ! এদের কিছু দুঃখ দুর্দশা দূর করতে পারবি ? নয়তো গেরুয়া পরে আর কি হল ? 'পরহিতায়' সর্বস্ব অর্পণ করার নামই হল সন্ন্যাস । ---- দেশের লোক দু বেলা দু মুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয় ফেলে দিই তোর শাঁখ বাজানো, ঘন্টা নাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা, সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়োলোকদের বুঝিয়ে কড়িপাতি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়নের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই । ----- জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।"

মানবপ্রেমিক, বৈদান্তিক স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এমনই এক আন্তরিকতার সূত্রে বাঁধা হয়ে গেছে যে তাঁর মহাপ্রয়াণের ১১১ বছর পরেও মনে হচ্ছে তিনি রয়েছেন – ছায়ার মতো সর্বত্র বিরাজমান । হ্যাঁ, তিনিই সেই খল্বিদং ব্রহ্ম, প্রভো, তত্বমসি ।

সারা বিশ্বজুড়ে স্বামীজীর জন্মসার্ধশতবর্ষের উদ্যোগ আয়োজন চলছে । গোটা পৃথিবীর এই সংকটময় পরিস্থিতিতে এবং দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে স্বামীজীকে আজ আমাদের বড়ই প্রয়োজন, কারণ স্বামীজী যে বলেছেন, "What we want is (this) sraddha. Unfortunately, it has nearly vanished from India and this is why we are in present state. What makes the difference between man and man is the difference in sraddha and nothing else. What makes one great and aother weak and low is this sraddha". ■

ঋণ স্বীকার যাঁদের লেখা থেকে –

১) হোসেনুর রহমান

২) ডঃ বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

৩) স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

৪) সাহিত্যিক শংকর

৫) শংকরী প্রসাদ বসু

৬) স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দ

তোমাকেই চাই

- অসীম কুমার

নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভারতের প্রতি জনজাতিকে বিশ্লেষণ করার প্রেক্ষিতে বিবেকানন্দ যে দীর্ঘ ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, তা তিনি জনসমক্ষে উন্মীলিত ও লিপিবদ্ধ করে গেছেন । আজ থেকে একশো পনের বছর আগে যে ভাবে ভারতের জনমানব ও মননকে বুঝেছিলেন তা আজও একই ভাবে বিদ্যমান । তাই তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতামালা পড়তে পড়তে মনে হয় তিনি সামনে থেকে বলে চলেছেন আর আমরা আত্মস্থ করার চেষ্টা করছি । সমাজ বিশ্লেষণ ও তার উত্থানের যে পদ্ধতি তিনি দেশের সামনে রেখেছিলেন, তেমনি ভাবে আজ অবধি কোন মহাপুরুষ বা যুগপুরুষ এত পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করেন নি । তাই তিনি ও তাঁর বাণী একই ভাবে চিরন্তন হয়ে প্রতীক্ষিত হয়ে আছে প্রতিক্ষণে পালিত হবার জন্য । বিবেকানন্দ ভারতকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে । তাকে উপযুক্ত করার জন্য বিদেশীদের থেকে সারবস্তু আহরণ করে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন । রবীন্দ্রনাথও বিশ্বকে জানতে চেয়েছিলেন । তাঁর রাস্তা ছিল ভিন্ন । কাব্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে তিনি ভারতকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন । সমগ্র বিশ্বকে অনুভব করেও এঁরা দুজনেই ভীষণ ভাবে ভারতীয় কিম্বা ভীষণ ভাবে বাঙালী । বিবেকানন্দ একেবারে ঘরের ভাষায় ঘরের মানুষকে শেখাতে চেয়েছিলেন বীজমন্ত্র । নিরন্তর পঠন ও বিশ্লেষণে যে ভাবনা তাঁর মনে এসেছে, সেটাই তুলে ধরেছেন সমাজের সামনে ।

মাত্র চারশো শ্রোতার সামনে মাদ্রাজে এক তাঁবুর মধ্যে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেটাকে 'ভারত গীতা' নাম দিলে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না । সেই গীতা অধ্যয়ন করে আজও প্রতিটি মানুষ উদ্দীপ্ত হতে পারে । কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাঁর প্রকাশ ও বিকাশ কিভাবে হবে ভারতের জনসমাজে, এ নিয়ে তাঁর সন্দেহ ছিলোই, তাই বারে বারে বলেছেন 'কার্য বিশাল ও দুরূহ সন্দেহ নেই, কিন্তু এই পথেই উত্তরণ – এগুতেই হবে ।'

শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে ভারতীয় মননে প্রোথিত রয়েছে ধর্মের বিভিন্নতা । সেটি যেমন একদিকে মহান উদারতার প্রতীক, তেমনি এক বিভাজিত সংস্কারের গোঁড়ামিও বটে । এক ধর্মকে কেন্দ্র করে একমুখী প্রচার ও বিকাশ হয়তো সম্ভব, কিন্তু সকল ধর্মের সমন্বয় যে দুরূহ ব্যাপার । ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে বেঁচে আছে মানুষ এই ভারতে । যত দিন গেছে ততই গুরুর সংখ্যা বেড়েছে যারা কেউই তেমন ভাবে সর্বভারতীয় বা বিশ্বজনীন হয়ে ওঠেনি । প্রতিটি ভাষায় একটি নিজস্ব ঢঙ এবং কৌতুক আছে । সেটি যখনই রপ্ত হয় তখনই সে ভাষা জনগণের সামনে রোচক ও মোহক হয় । বাংলা ভাষার কৌতুক অন্য ভাষায় সঞ্চারিত হবার উপায় নেই । বিবেকানন্দ সংস্কৃত থেকে চলিত ভাষা অবধি বিচরণ করে এক নিজস্ব ভাষায়, যে ভাষা কেবল মাত্র বাঙালীর আন্তরিক, সে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাঁর অনেক রচনাশৈলী । তাই তিনি ও তাঁর লেখা যতটা বাঙালী ততটা ভারতীয় নয় । সেটা একটা ভাষার অন্তরায় বলেই তিনি আজ অবধি এত বিশাল ভাবে ভারতীয় হয়ে ওঠেন নি ।

আমার মনে হয় স্বামীজীর মধ্যে এমন অনেক দিক ছিল যাতে শিক্ষিত ছাড়াও সাধারণ মানুষও অতি সহজে আকৃষ্ট হতে পারতো । যেমন তাঁর গানের গলা, অসাধারণ জ্ঞান, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, ভাষার দখল, বাগ্মিতা এবং সর্বোপরি গৈরিক বসন পরিহিত মাথায় সুচারু পাগড়ী বিশিষ্ট এক সুন্দর অবয়ব । কথায় বলে 'পহলে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী'—জনগণকে সম্মোহিত করার মতো এক প্রেজেন্টেবল ফর্ম । একজন ভাল বক্তাকে হাজার শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে শোনে । গত একশো বছরে তেমন মানুষ তো আর একজনও এলো না । তিনি ধর্মীয় গুরু নন – মহাপুরুষ । তিনি একজন সমাজ সংস্কারক জ্ঞানী মানুষ যিনি সনাতন ধর্মের সাথে অন্য সব ধর্মের মূল অবধি পৌঁছতে পেরেছিলেন । সেগুলির মধ্যে থেকে কেবল মাত্র সার অংশগুলি বেছে নিয়ে ভারতীয় ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন ।

রামকৃষ্ণ দেবকে বিশ্লেষণ করা যায় না । তিনি যে ভাবে লোকশিক্ষা দিয়েছেন তা কোন পুঁথিগত বিদ্যা নয় । সমাজের মধ্যে থেকেও তাঁর উপলব্ধি জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল । সমানভাবে তিনি আধ্যাত্মিক জগতে আর জনজীবনে বিচরণ করতেন । মানুষের মঙ্গল কামনায় প্রতি মুহূর্তে তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী এক চিরন্তন রূপ পেয়েছে । স্বামীজী কিন্তু তেমনটি নন । তিনি এক পাঠক, এক ধার্মিক, এক তাত্ত্বিক, এক বিজ্ঞানী । বেদবেদান্ত উপনিষদ, গীতা, কাব্য মহাকাব্য অধ্যয়ন করে তার সারবত্তা তুলে এনেছেন মানুষের সামনে । গীতা তত্ত্বে যেমন বলেছেন, 'যুদ্ধের সময় এত জ্ঞান, ভক্তি আর যোগের কথা আসিল কোথা হইতে ? সেই সময় কি কোনও সাংকেতিক লিপিকুশল উপস্থিত ছিলেন যিনি সে সমস্ত টুকিয়া লইয়াছিলেন !' একদম খাঁটি কথা । এটি হোল মানুষের বোধ ও বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ । ধর্মগ্রন্থকে অন্ধের মতো বিশ্বাস না করে বিশ্লেষণ করে সারবস্তু তুলে আনা ।

এবার তার বক্তব্যের স্বরূপের সঙ্গে বর্তমানকে মেলালে কেমন সমীকরণ তৈরি হয় তা একটু ভাবা যাক্ । তিনি কি আজও প্রাসঙ্গিক, তেমন সমানভাবে ভাস্বর ! তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণ করা কিম্বা না প্রমাণ করার বিষয়ে অনেক যুক্তিতর্ক দাঁড় করানো যায় । কিন্তু যদি সারবস্তুকে আত্মস্থ করার প্রয়াস বা মনন থাকে, তবেই বুঝি তাঁকে মূল্যায়ন করা যায় ।

শ্রদ্ধাবান হও, বীর্যবান হও, পরহিতায় জীবনপাত কর । এই বীজমন্ত্র মানুষের মনে কিভাবে গ্রন্থিত হবে ? এই মন্ত্র কি এককভাবে মানুষের মনে ঢুকবে নাকি সামগ্রিকভাবে ঢোকাতে হবে ? 'কলকাতা অভিনন্দনের উত্তর' প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজ জাতির প্রশংসা করেছেন । বলেছেন ইংরেজ বীরের জাতি, এদের মস্তিষ্ক স্থূল, কিন্তু একবার ঢুকিয়ে দিলে তা তারা করেই ফেলে । ইংরেজ হৃদয়ের মূল উৎস কোথায় কে জানে । তাদের শিক্ষাই ভাব গোপন করা । বাল্যকাল হইতে এই শিক্ষাই তারা পেয়ে থাকে । সুতরাং বাল্যকাল থেকে যদি কোন শিক্ষা মনের মধ্যে লালিত হয় তবেই তা পরবর্তী জীবনে প্রতিফলিত হয় । ইংরেজ একে একে অনেক দেশকে জয় করলেও বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সংস্কার ও শিক্ষা দিতে কোন কার্পণ্য করেনি । যে দেশে গেছে সেখানেই শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছে । যেহেতু তারা বাল্যকাল থেকে একটা সিস্টেমের মধ্যে লালিত হয়েছে তাই তার প্রতি সারা জীবন শ্রদ্ধাবান হতে পেরেছে । আমাদের দেশে তেমন কোন দেশগত শিক্ষা পদ্ধতি বা চরিত্র গঠন পদ্ধতি তৈরি হয় নি । আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এদেশের মধ্যে রয়েছি । কখনও জাতিগত, কখনও ধর্মগত, কখনও ভাষাগত বিভাজনে আমরা নিজেদের গন্ডিবদ্ধ রেখেছি । তাই এক জাতি, এক প্রাণ, এক ধর্ম কোনোদিন হয় নি আর হবেও না, এবং ভাষার অন্তরায় থাকার জন্য বিবেকানন্দর আহৃত জ্ঞান বা শিক্ষা বাঙালীর মনে স্থায়ী আসন করলেও সর্বভারতীয় হয়ে উঠতে পারেনি । এখানে আমাদের কর্তব্য কি ? যদি স্বামীজীকে বিজ্ঞানী ও সমাজ সংস্কারক বলে মানি তবে তাঁর দর্শিত কোন্ পথে গেলে এক মানবিক উত্তরণ হবে ?

গত একশো বছরে সমাজ তার নিজস্ব পথ ধরে পরিবর্তিত হয়েছে । বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্থান পতনের ফলস্বরূপ এই আমাদের বর্তমান ভারত । হিন্দুধর্ম সংজ্ঞাহীন, বল্গাহীন, নানান প্রান্তিক গুরুর স্বায়ত্তশাসনে দিগ্‌ভ্রান্ত । মুসলমান ধর্ম সীমাবদ্ধ – অন্য জাতির প্রবেশ নিষেধ, মূল্যায়ন নিষেধ এবং পরিমার্জন বহু দূরের কথা । খ্রীষ্টধর্মও অতি শান্ত অথচ কট্টরভাবে নিজেতে মশগুল । তাদের আবাহনও নেই আর বিসর্জনও নেই । তবে কি মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে ? আসলে মূল্যবোধটাই মনুষত্ববোধ । সেটা তো সকল দেশের মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান । হয়তো তার সংখ্যা কমে আসছে । যদিও আমি মনে করি যে কোন সিস্টেমে কুড়ি থেকে পঁচিশ শতাংশ মানুষ সঠিক পথের অনুগামী হলে সমাজ বা সিস্টেম টিঁকে যায়, এই কুড়ি পঁচিশ শতাংশের সমতুল সব সময়ই সমাজে বিদ্যমান । এই কুড়ি শতাংশকে ওপরের দিকে তুলতে পারলেই একটা দিকদর্শনের আভাষ পাওয়া যায় । ঠিক এখানেই বিবেকানন্দ ভীষণভাবে প্রয়োজন। সে সমাজের প্রতি ক্ষেত্রেই প্রবলভাবে সত্য । স্বামীজীকে কেন্দ্র করে একটা নিরন্তর প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে এ ভারতীয় জনমানসে । স্বামীজীর সৃষ্ট রামকৃষ্ণ মিশন সে পথে চলেছে যুগ যুগ ধরে । তবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর বাণী ও রচনা যে সকল ছাত্রের মধ্যে কিঞ্চিত প্রক্ষিপ্ত করা উচিত, সেখানে বুঝি কিছুটা খামতি রয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত । "মন্দিরের সঙ্গে শিক্ষক ও প্রচারক গঠন করিবার জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র থাকিবে । এখান হইতে যে সকল শিক্ষক শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা সর্বসাধারণকে ধর্ম ও লৌকিক বিদ্যাশিক্ষা দিবেন"---(ভারত ভবিষ্যত) । সুতরাং প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণে শিক্ষকের প্রয়োজন, তা বোধহয় কোনও কালে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই । পদার্থবিদ্যা আর রসায়নের পাশে দশ পাতা ভারত ভবিষ্যত পঠনে যে লাভ বৈ ক্ষতি নেই, সেটি ভাববার একান্ত প্রয়োজন আছে । দেশকে উজ্জীবনের জন্য স্বামীজী যুব সম্প্রদায়কে ডাক দিয়েছিলেন, কারণ সমাজের প্রতিটি অন্যায় বা কুসংস্কারের প্রতি যুব সম্প্রদায়ই প্রথম প্রশ্ন তোলে ।

সমাধানের প্রশ্নে তারাই ঝাঁপিয়ে পড়ে । সে যুব সম্প্রদায় এখনও রয়েছে তেমনি সজীব । প্রয়োজন শুধু জ্ঞানের খানিক আলো তাদের মনে ঢুকিয়ে দেবার । সে জ্ঞান দেশ বিষয়ক, সমাজ বিষয়ক, শিক্ষা বিষয়ক আর পরহিত বিষয়ক । আর তার জন্য দিকদর্শন দেবে স্বামীজীর বাণী ও রচনা ।

ধর্মের একটা নিজস্ব নেশা আছে । গুরুর সামনে হাত জোড় করে নিজেকে সমর্পণ করার মধ্যেও একটা মাদকতা আছে, আর সেটিকেই মূলধন করে, গুরুকে কেন্দ্র করে রাজত্ব করে স্তাবকবৃন্দ আর ধুরন্ধররা । ধর্মের নামে মানুষ এখানে অকাতরে দান করে । কিছু কিছু মন্দির সম্প্রদায়ের বৈভব দেখলে বিস্মিত হতে হয় । উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই তিরুপতি মন্দিরের কোষাগার ফুলতে থাকে । মুম্বাইয়ের গণপতি দর্শনে দশ কোটি টাকারও ওপরে সংগ্রহ হয় । গণপতির মূর্তি দেখার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষ লাইন দেয় । শবরীমালার মন্দিরে শত শত দর্শনার্থী ভিড়ের চাপে মরে । কুম্ভমেলায়, বৈষ্ণোদেবী দেখার রাস্তায় শত শত দর্শনার্থী মরে । কি বিশাল আকুলতা ! এসব জন্ম থেকে মানুষের মনে প্রক্ষিপ্ত তার পরিবার দ্বারা । পুঁথিগত বিদ্যার কোন সাধ্য নেই এসব থেকে মানব মনকে সুস্থ চিন্তার পথে ফিরিয়ে আনার । রাজনীতির প্রসঙ্গ নাই বা টানলাম, কারণ সেখানে যে যত বড় পাপী, ক্রিমিনাল, সে তত বড় নেতা ।

তবুও কারগিল যুদ্ধে সারা দেশে ভেরী বাজে । মনে আর প্রাণে তৈরি হয় দৃঢ় চেতনা । মুম্বাইয়ের তুমুল বন্যায় হাজার হাজার মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় । কচ্ছের ভূকম্পে হাজার ট্রাক ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলায় জনগণ উত্তাল হয় । নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নামে । সুতরাং প্রতিটি চেতনা, মূল্যবোধ আর মানবতা হারিয়ে যায় নি সমাজ থেকে ।

কে নিয়ে যাবে আবার বিবেকানন্দকে এ সমস্ত জনগণের মধ্যে ? তাদের বোধগুলিকে এক নির্দ্দেশিত পথে পরিচালন করতে ?

এ দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মিশন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি নাগরিকের । এই আমার বক্তব্যের শেষ ও সার কথা । সাধুরা প্রদর্শক, আমরা ধারক ও বাহক । জনমানস এখনও উন্মুখ পরহিতের মাধ্যমে নিজেকে উজ্জ্বল করতে, দানের মাধ্যমে নিজেকে মহীয়ান করতে, ত্রাণের মাধ্যমে নিজেকে সমাজের অঙ্গীভূত করতে, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক উন্নতির মাধ্যমে নিজেদের ভারতীয় করতে । ■

What was The Greatest Speech?

Intelligent Life, a bi-monthly lifestyle and culture magazine from The Economist, in it's section "Big Question" for the month of July/ August 2013 issue considers the art of oratory, and asks, what was the greatest speech? Six writers

chose a speech, and over the next two weeks the magazine published their views online. The Magazine conduced a poll and the voting results are as below:

More than half the (54%) votes went to **Swami Vivekananda**, a young 30 year old Hindu monk whose speech about tolerance and universal acceptance at the first World's Parliament of Religion in 1893 resonated with the writer Mark Tully. Abraham Lincoln's succinct three-minute Gettysburg address was James Harding's choice—and 17% of readers agreed. Tina Brown's nomination was Hillary Clinton's speech about women's rights in Beijing in 1995. She got a standing ovation on the day, and 7% of your votes. Pericles's funeral oration, from 431BC, "still sounds radical 2,500 years later," said Natalie Haynes. A handful of readers (6%) agreed. Gillian Slovo went for Nelson Mandela's words from the dock in 1964 (5%) and Johnny Grimond for Thomas Babington Macaulay'ssupport of Jewish rights in 1833 (3%).

Mark Tully* argues that it was Swami Vivekananda's first-ever public speech, delivered in Chicago, 1893. Swami Vivekananda, who had never been outside India before, nor spoken in public, was such a hit at the Parliament that he was asked to speak six times. He said. "We believe not only in universal toleration but we accept all religions as true." The New York Herald said, "Vivekananda is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions."

He was relevant then and is relevant today for his constant affirmation that all religions are paths to God, and his call for tolerance. He ended his first speech by saying, "I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death-knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal."

Vivekananda's speeches at the Parliament resonate today for the many who claim to be spiritual but not religious, who reject religion based on faith and seek experience of God. He said, "The Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realizing—not in believing but in being and becoming."

*Mark Tully was the BBC's bureau chief in India for 22 years.

Reference:

IntelligentLife website:
http://moreintelligentlife.com/page/which-best-speech
http://moreintelligentlife.com/blog/georgiagrimond/greatest-speech-was
http://moreintelligentlife.com/content/ideas/anonymous/vivekananda

হিমালয়ের প্রেক্ষাপটে দুই মহামানব –

- ভাস্বতী ঘোষ সেনগুপ্ত

পৃথিবী তথা বিশ্বের ইতিহাসে কালজয়ী, বিশ্বজয়ী,আন্তর্জাতিক মানবিকতা ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে যে মহামানবেরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে দুই মহামানবকে হিমালয়ের পটভূমিতে দেখার চেষ্টা করব –তাঁরা উভয়েই তাঁদের আপন কর্মক্ষেত্রে ও চরিত্রগুণে হিমালয়েরই সমতুল্য অথবা হিমালয়ের থেকেও উচ্চ এবং উভয়েরই বিশালত্ব, গভীরতা, মানবিক উচ্চতা, ও ব্যাপ্তি হিমালয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । দুজনের জীবনে হিমালয় এক বিশেষ স্থান অর্জন করেছে । বার বার নানা কথায়, লেখায়, ভাষণে হিমালয় ফিরে এসেছে – কি অসীম আকর্ষণ শক্তি ও বিশেষত্ব এই হিমালয়ের তা এই দুজনেরই লেখার মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। হিমালয় স্বামী বিবেকানন্দের 'নিজ নিকেতন' । স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবনপর্বকে যদি একবার ফিরে দেখি ও ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে পৌছাই; সেখানে দেখব ভারত আত্মার বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় জীবনে হিমালয়ের ভূমিকা কি তা বর্ণনা করেছিলেন তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতার আবেগ নিয়ে । আলমোড়ায় অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন –

"আমাদের পূর্বপুরুষগণ শয়নে, স্বপনে যে ভূমির বিষয়ে ধ্যান করিতেন – এই সে ভূমি – ভারতজননী পার্বতীদেবীর জন্মভূমি । এই সেই পবিত্রভূমি, যেখানে ভারতের প্রত্যেক যথার্থ সত্যপিপাসু আত্মা শেষ অবস্থায় আসিয়া জীবনের যবনিকাপাতে অভিলাষী হয় ।"

"এই পবিত্র ভূমির গিরিশিখরে, এর গভীর গহ্বরে, এর দ্রুতগামিনী স্রোতস্বতীসকলের তীরে, সেই অপূর্ব তত্ত্বরাশির চিন্তা করা হইয়াছিল যার কণামাত্রের প্রকাশও বৈদেশিকগণের নিকট হইতে বিপুল শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে । .....এই হিমালয় পর্বত বৈরাগ্য ও ত্যাগের সাকার মূর্তিরূপে দণ্ডায়মান । এই ত্যাগ ও বৈরাগ্য হইতে উচ্চতর ও মহত্তর কিছু মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার নাই ।"

"এই হিমালয়ের সহিত আমাদের জাতীর শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিসমূহ জড়িত । যদি ভারতের ধর্মেতিহাস হইতে হিমালয় বাদ দেওয়া হয়, তবে উহার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে ।"

স্বামীজী নিজের সুন্দরতম মৃত্যুকামনা করেছিলেন হিমালয়ের ক্রোড়েই – "এই সেই ভূমি – অতি বাল্যকাল হইতে আমি যেখানে বাস করিবার কল্পনা করিয়াছি । আমার প্রাণের বাসনা, এই ঋষিগণের প্রাচীন নিবাসভূমি, দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি – এই পর্বতরাজের ক্রোড়ে আমার জীবনের শেষ কয়টি দিন কাটাইব ।"

হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের । পরিব্রাজক জীবনে স্বামীজী ধর্ম–ভারতকে দেখেছেন – সাধারণ এবং অসাধারণ, সকল মানুষের মধ্যে । ত্রৈলঙ্গস্বামী, স্বামী ভাস্করানন্দ, পওহারী বাবাকে দেখেছেন, অল্পদিন পূর্বে লোকান্তরিত রঘুনাথ দাশের আশ্রমে গিয়ে ওঁর অপূর্ব জীবনকথা শুনে মোহিত হয়েছেন, দেখেছেন এক মুসলমান সাধুকে, "যার অঙ্গের প্রতিটি রেখা বলে দিচ্ছিল তিনি একজন পরমহংস ।" জেনেছেন যে কোনো মানুষের পতন তাঁর সম্বন্ধে শেষকথা বলে না । পওহারী বাবার বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিল একটি চোর, পওহারী বাবা জেগে উঠতে সে তখন জিনিসগুলি ফেলে পালাচ্ছিল, তখন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে ঐ জিনিষগুলি তাকে প্রীতিভরে অর্পণ করেন উক্ত মহাপুরুষ ; স্বামীজী পরিবর্তিত মানুষটিকে হিমালয়ে দেখেন – " অনুভূতির অতি উর্ধস্তরে সেই সাধু অবস্থিত, " আর স্বামীজীর মন কেড়েছিল হৃষীকেশের পাগল দিগম্বর সাধুটি । সেই পাগল সাধু ছিলেন ছেলেদের কাছে মজার খেলার জিনিষ ;

যাকে ঢিল ছুঁড়ে রক্তাক্ত করে দেওয়া যায় কিন্তু তাঁর হাসি থামানো যায় না । স্বামীজী যখন তাঁকে ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে শুশ্রূষা করেছিলেন তখনো তিনি হাসিতে লুটোপুটি – " কেয়া মজাদার খেল হ্যায়, বিলকুল বাবা কে খেল । কেয়া আনন্দ ।" এই পর্বেই স্বামীজী জেনেছিলেন সেই সাধুর বিষয়ে; যাকে আক্রমণ করে বাঘ যখন মুখে করে নিয়ে যাচ্ছিল তখনো বলেছিলেন; " শিবোহহম, শিবোহহম ।" স্বামীজী লিখেছেন " আমি হৃষীকেশের জঙ্গলে সন্ন্যাসিবেশধারী ত্যাগী মেথরদিগকে বেদান্ত পাঠ করিতে দেখিয়াছি । অনেক গর্বিত অভিজাত ব্যক্তিও তাঁহাদের পদতলে বসিয়া আনন্দের সহিত উপদেশ পাইতে পারেন ।"

আলমোড়ার নিকটবর্তী কাঁকড়িঘাটে উচ্চ উপলব্ধির পরে তিনি যে ভাষায় তার রূপ প্রকাশ করেছেন তাকে বিশুদ্ধ অদ্বৈত অনুভূতি (যার রূপ স্বামীজীর বিখ্যাত গানে পাই – নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্কসুন্দর ইত্যাদি) বলা যাবে কিনা তা তাত্বিকরা ঠিক করবেন, বিশ্বাত্মার এই বিবিধ প্রকাশ অনাদি –বিশিষ্টাদ্বৈত বলেই মনে হয় । অর্থাৎ আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি সবই সাকার ও নিরাকারের মিলনে সংগঠিত । আলমোড়া শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে কাঁসারদেবী পাহাড়ের গুহায় উচ্চ উপলব্ধি ও পরবর্তী বাধ্যতামূলক অবতরণের কাহিনী এখানে স্মর্তব্য – " এই গুহামধ্যে তিনি দিবারাত্র কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করলেন – তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সত্যলাভ করতেই হবে । সেই গভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সেখানে তাঁর ধ্যানভঙ্গ ঘটানোর মতো কেউ-ই ছিল না – বোধিলাভের পথে তিনি ক্রমান্বয়ে নানা উপলব্ধি লাভ করলেন – এবং দিব্যাগ্নিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল তাঁর আনন । তারপর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম শিখরে যখন তিনি উপনীত, তখনই তাঁর পরম বাঞ্ছিত ব্যক্তিমুক্তির চির-আনন্দের পরিবর্তে কাজের জন্য প্রচন্ড প্রেরণাবোধ করলেন, তা যেন সজোরে তাঁকে ঐ সাধনভূমি থেকে টেনে বার করে আনল ।" (স্বামীজীর বিখ্যাত ইংরেজী জীবনীর প্রথম সংস্করণে লিখিত) এই হোল স্বামীজীর চূড়ান্ত উপলব্ধির এক সাধনপীঠ – হিমালয়ের গিরিগুহা ও অন্যটি কন্যাকুমারিকায় ভারতসমুদ্রের শিলাখন্ড – একটির ধ্যানলব্ধ উপলব্ধি বিবেকানন্দকে রামকৃষ্ণ–বার্তাবহ সুমহান ধর্মাচার করেছে, অন্যটি করেছে সমাজবিপ্লবী ও সমাজসংস্কারক ।

এবার আসি কবিগুরুর/বিশ্বকবির হিমালয় পর্যায়ে । 'জীবনস্মৃতি'তে কবি

লিখেছেন – "চৈত্রমাসের শেষে ডালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল । অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না । হিমালয়ের আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল " ...

এই হিমালয়ের অধিত্যকায় তাঁর ভ্রামণিক জীবনের প্রথম পরিব্রাজন, যখন লাঠি হাতে সেখানকার বনানীতে প্রবেশ করে মনে হয়েছিল "বনস্পতিগুলা প্রকান্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কত শত বৎসরের বিপুল প্রাণ । কিন্তু, এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না, বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র যেন তাহার একটি বিশেষ স্পর্শ পাইতাম । যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকান্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী" .....

"বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল, যদিও তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল । এমন কি পথের যে অংশে রৌদ্র পড়িত না সেখানে তখনো বরফ গলে নাই । এখানেও কোনো বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপন ইচ্ছায় পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে পিতা একদিনও আমাকে বাধা দেন নাই ।"

"আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর । রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাঁচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রলোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পান্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম । এক একদিন জানিনা কত রাত্রে, দেখিতাম পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ সঞ্চরনে চলিয়াছেন । কাঁচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন ।"

"তাহার পর আর এক ঘুমের পড়ে হঠাৎ দেখিতাম পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন । তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ন দূর হয় নাই । শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদবোধন ।"

প্রসঙ্গতঃ এখানে মনে রাখা প্রয়োজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর শিশুপুত্রকে হিমালয়ের কোলে বেদ ও উপনিষদের পাঠে দীক্ষিত করেছেন মাত্র এগার বছর বয়সে ।"

"সূর্যোদয় কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা অন্তে এক বাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন ।"

ডালহৌসির পাহাড়ে মহর্ষির সঙ্গে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দেখতে দেখতে বিশ্বব্রহ্মান্ডের বিচিত্ররূপ কাঁচা বয়েসেই কবির চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল । বিজ্ঞানচেতনার চাপা উত্তেজনা ভাষা পেল বালক রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম প্রবন্ধে – বিষয় 'তারামন্ডলী এবং মহাকাশ ।' তাঁর নিজের ভাষায় –" সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ।" শুরু হল সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের এক বিচিত্র অভিজ্ঞান ।

তার চেয়েও রোমাঞ্চকর আত্ম-আস্বাদন ঘটে, যখন অমৃতসরের সন্ধ্যাকালে শান্ত বাগানের সামনের বারান্দায় ধ্যানস্থ পিতাকে তাঁর গান শোনাবার ডাক পড়ত । কবির কথায় – "যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন । তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত । চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। আমি বেহাগে গান গাহিতেছি – তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে, কে সহায় ভব অন্ধকারে । তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন – সেই সন্ধ্যাবেলার ছবি আজও মনে পড়িতেছে ।"

হিমালয়ে তাঁর পিতার সাথে কালযাপন রবীন্দ্রনাথের মনোজগৎ তথা দৃষ্টিজগতে এক বিপুল পরিবর্তন বহন করে আনে । দেবতাদের সাথে সাক্ষাৎ হল যেন । বাড়িতে ফিরে নিষেধের গন্ডি লুপ্ত হয়েছিল । এককালে মানুষ ও পর্বতে সাক্ষাৎ হত – কবিতায় পড়া সেই আক্ষেপ মনে পড়ার কথা । পরবর্তীকালে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' কাব্যের মধ্যে হিমালয়ের পটভূমি লক্ষ করার বিষয় ।

কবিগুরুর প্রকৃতির কোলে শিক্ষালাভ পরবর্তীকালের বিশ্বভারতীর সূচনাপর্ব বলে মনে হয় । রবীন্দ্রনাথের জীবনে হিমালয়ের ভূমিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে যখন তিনি স্থির করলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন ঠিক সেই সময় একদিন আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে কবিগুরুর দেখা হোল । নিবেদিতা তখন ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভাবছিলেন । তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ আমাদের দেশের ছেলেরা যেন দলে দলে হিমালয়ের পাহাড়ে পদব্রজে বেড়াতে যায়, বিশেষত তীর্থস্থানগুলি দেখে আসে । এবার রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় আসি –"বাবা যেই নিবেদিতার কাছ থেকে শুনলেন কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথম দলটি নিয়ে বেলুড়মঠের সদানন্দস্বামী কেদারবদরী রওনা হবেন, তখনই তাঁর ইচ্ছা হোল আমাকেও তাঁদের সঙ্গে পাঠান । ------ হরিদ্বারের পথ দিয়েই তীর্থযাত্রীরা সাধারণতঃ কেদারনাথে যায়, কিন্তু সেই রাস্তা খুব ভিড় বলে স্বামীজী আলমোড়ার পথ দিয়ে যাবেন স্থির করেছিলেনন ।" এর পরের বর্ণনায় ভেতরকার অপূর্ব চিত্রলতা আর গাঢ় নিবিড় অনুভব কবিপুত্রের লেখনীতে পরিস্ফুট, হিমালয় ভ্রমণ পড়লে সমগ্র ছবিটি পরিষ্কার মনের পর্দায় দেখা যায় ।

ভ্রামণিক রবীন্দ্রনাথের পথের সঞ্চয় ভরে উঠেছে দেশ সংসর্গে ও মানবসন্নিধানে – যার শুরু পিতার সাথে হিমালয় ভ্রমণ । শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনদর্শনে দৃপ্ত উচ্চারণে জানাতে পেরেছেন "মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব, আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন ।"

এই একই বানীর রেশ আবার স্বামী বিবেকানন্দের লেখাতেও –

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।"

হিমালয়ের কাছে দীক্ষিত এই দুই চিরস্মরণীয় মহামানব, যাঁদের আবির্ভাব সমগ্র মানব সমাজকে ধন্য করেছে, যাঁরা ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসন দিয়েছেন – তাঁদেরকে আমার প্রণাম জানাই । ■

গ্রন্থ ঋণ : স্বামী বিবেকানন্দ – 'নতুন তথ্য নতুন আলো' – শঙ্করীপ্রসাদ বসু
জীবনস্মৃতি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পিতৃস্মৃতি - রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হৃদয়ের মিলন – তেনশিন ওকাকুরা ও স্বামী বিবেকানন্দ

- কাজুহিরো ওয়াতানাবে

Allow me to call you a friend. We must have been such in some past birth. Your cheque for 300 rupees duly reached and many thanks for the same. I am just thinking of going Japan, but with one thing or another and my precarious health, I cannot expedite matters as I wish. Japan to me is a dream ---so beautiful that it haunts one all his life.

With all love and blessings,

Vivekananda

১৯০১ সালের ১৩ই জুন স্বামীজী এই চিঠি লিখেছিলেন। প্রাপকের নাম টোকিওর কাকুযো ওকাকুরা ওরফে তেন্‌শিন ওকাকুরা। এর আগে তেন্‌শিন স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে আমন্ত্রণ করার পরিকল্পনা করেন এবং ভ্রমণ খরচ হিসাবে ৩ শো টাকা পাঠিয়ে দেন । বিবেকানন্দের চিঠিটি লেখা হল সেই আমন্ত্রণের উত্তর হিসাবে ।

চিঠিটি যখন প্রেরণ করা হয়, তখনও প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে নি এই দুজন মনীষীর মধ্যে । তাহলে স্বামীজী এবং জাপানের প্রখ্যাত শিল্পকলা সমালোচক ও চিন্তাবিদ তেন্‌শিন ওকাকুরা কিভাবে একে অন্যকে চিনেছিলেন তথা তাঁদের মধ্যে কিরকম ভাবের আদান-প্রদান হয়েছিল, সেটি জানার চেষ্টা করা হবে এই লেখার মাধ্যমে ।

তেন্‌শিনের জন্ম হয় ১৮৬২ সালে বন্দর নগর ইয়োকোহামাতে। তাঁর বাবা ছিলেন সামন্ত যুগে সামুরাই (যোদ্ধা) শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত একজন ব্যক্তি, তবে প্রভুর আদেশ অনুযায়ী রেশম সুতোর ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন । সেই যুগে রেশম সুতো ছিল জাপানের অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য । তাঁর দোকানে বিদেশীদের আনাগোনা হত । তাঁদের কথা শোনার মাধ্যমে তেন্‌শিন ইংরেজির সংস্পর্শে আসেন । এ ছাড়া তাঁর বাবার আদেশে তিনি ইয়োকোহামায় বসবাসকারী মার্কিন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক জেমজ হামিলটন বালা (James Hamilton Ballagh) -র কাছে ইংরেজি শেখেন । তখনকার যুগে ইংরেজি-জানা জাপানীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য । তেন্‌শিন ইংরেজীর বিরল দক্ষতা লাভ করতে পারেন তাঁর ছোটবেলাকার পরিবেশ ও পড়াশোনার কল্যাণে ।

তখনকার জাপান ব্যাপক সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল । শিক্ষা ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করা হয় । সেই অনুযায়ী তেন্‌শিন মাত্র ১৬ বছর বয়সে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং প্রধানত রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে অধ্যয়ন করেন । ১৯ বছরে স্নাতক হওয়ার পর তিনি শিক্ষা মন্ত্রকে চাকরি পান । তাঁর মূল কর্মক্ষেত্র ছিল চারুকলা শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাপনা । সেই সূত্রে চিত্র অঙ্কন ও ভাস্কর্য নির্মাণের পেশাদার শিল্পীদের লালন-পালনের জন্য জাপানের প্রথম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "টোকিও শিল্পকলা বিদ্যালয় (Tokyo School of Fine Arts)" প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন তেন্‌শিন । এই বিদ্যালয়ের শুভ-উদ্বোধন হয় ১৮৯৮ সালে । তেন্‌শিন প্রথমে চিত্র অঙ্কন বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগ দেন এবং পরবর্তী বছরে মাত্র ২৯ বছর বয়সে বিদ্যালয়ের প্রধানের পদে আসীন হন। সামন্ত যুগের পরিসমাপ্তির পরে শীঘ্রই আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার ব্রত গ্রহণকারী জাপানে নিঃসন্দেহে তেন্‌শিন ছিলেন উদীয়মান তরুণ নেতাদের অন্যতম ।

তৎকালীন জাপান অতি ব্যস্ত ছিল যথাসম্ভব পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির পাশাপাশি দাঁড়াতে । সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জিনিসকে কেবল উচ্চ মূল্যায়ন করে জাপানের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ নাকচ করার প্রবণতা দেখা যেত । চারুকলা শিল্পের জগতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এ রকম প্রবণতার মাঝে তেনশিন ছিলেন এমন ব্যক্তি যিনি দেশের ঐতিহ্যগত চারুশিল্পের পুনর্মূল্যায়নের প্রচেষ্টা চালান এবং বিশ্বের কাছে তার তাৎপর্য যথাযথভাবে তুলে ধরেন ।

কিন্তু অচিরেই সরকারের কর্মকর্তা হিসাবে তেন্‌শিনের অবস্থানে গণ্ডোগোল দেখা যায় । পশ্চিমী ধাঁচের চিত্র অঙ্কনে গুরুত্ব প্রদানকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে রেষারেষি এবং ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারীর ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন তেন্‌শিন । বিদ্যালয়টির প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ৮ বছর পর ১৮৯৮ সালে তিনি পদটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । তেন্‌শিনের ভক্ত তাইকান ইয়োকোইয়ামা ও কান্‌যান শিমোমুরা প্রমুখ কয়েকজন শিল্পী ও অধ্যাপক তেন্‌শিনের অনুসরণে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন । তাঁদের নিয়ে তেন্‌শিন নিহোন বিজুৎসুইন (জাপান শিল্পকলা ইন্‌স্টিটুট বা Japan Art Institute) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি জাপানের নতুন ও নিজস্ব চিত্রশিল্প সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করে যান । তেন্‌শিনের পথনির্দেশনার মাধ্যমে তাইকানরা পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হন ।

টোকিওর উয়েনো এলাকায় প্রতিষ্ঠিত নিহোন বিজুৎসুইনে ১৯০১ সালে তেন্‌শিন কয়েকজন বিদেশীদের জন্য জাপানী শিল্পকলার উপর ইংরেজিতে বক্তৃতা সভার আয়োজন করেন । এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন জসেফিন মাক্‌লাউড(Josephine MacLeod) নামক একজন মার্কিন মহিলা । মাক্‌লাউড ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের নিবেদিত ভক্ত। ১৮৯৫ সালে নিউইয়র্কে প্রথমে বক্তৃতা শুনে তিনি স্বামীজির ভক্ত হয়ে যান । মিয মাক্‌লাউড টোকিওতে এসেছিলেন ভারতে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে দেশে ফেরার পথে ।

In Japan I made the acquaintance of Okakura Kakuzu(Kakuzo) who had founded the fine arts Bijutsuin school of painting in Tokyo. (Reminiscences of Swami Vivekananda by Josephine MacLeod)

মাক্‌লাউড তেন্‌শিনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ অতি চমৎকার ব্যক্তিত্ব । তিনি এও জানান যে স্বামীজী জাপান ভ্রমণে আসার ইচ্ছা পোষণ করছেন । ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম মহাসভা (World's Parliament of Religions)-এ অংশগ্রহণের জন্য আমেরিকা যাওয়ার পথে বিবেকানন্দ কিছু দিন জাপানে কাটিয়েছিলেন এবং দেশটির সংস্কৃতি ও লোকজন সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা লাভ করেন ।

He(Okakura) was very anxious to have Swami come over and be his guest in Japan.

মাক্‌লাউডের কথা শুনে তেন্‌শিন ভীষণ আগ্রহী হন । সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দের কাছে জাপানে আসার জন্য আমন্ত্রণ পত্র ও ভ্রমণ খরচ বাবদ ৩ শো টাকা পাঠিয়েছিলেন । কিন্তু তত দিনে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দিল । জাপানে যাওয়া সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে । তিনি তেন্‌শিনের কাছে জবাবের চিঠিতে দুঃখের সঙ্গে সে কথা জানিয়েছিলেন । এই প্রবন্ধের শুরুতে আমরা বিবেকানন্দের সেই চিঠি ইতিমধ্যেই পড়েছি ।

বিবেকানন্দের কাছ থেকে উত্তরের চিঠি পেয়ে তেন্‌শিন নিজে ভারতে চলে যেতে উদ্যত হলেন ।

তিনি মিয মাক্‌লাউড, তরুণ জাপানী বৌদ্ধ পুরোহিত শিতোকু হোরি প্রমুখকে সঙ্গে করে ১৯০১ সালের নভেম্বর মাসে জাপান থেকে পাড়ি জমান । তাঁরা ভারতে পৌঁছান ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসে । ৬ই জানুয়ারি তেন্‌শিন কলকাতায় বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করেন । তাঁদের পাশে ছিলেন জসেফিন মাক্‌লাউড । এদিনের কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন;

One of the happy moments of my life was when after a few days at Belur. Mr. Okakura said to me rather fiercely. " Vivekananda is ours. He is an Oriental. He is not yours." Then I knew there was a real understanding between these two men. A day or two after, Swami said to me, "It seems

as if a long lost brother has come." (Reminiscences of Swami Vivekananda by Josephine MacLeod)

এদিকে প্রথম সাক্ষাতে তেন্‌শিন্‌ও বিবেকানন্দের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন । স্বামীজীর চরিত্র ও তাঁর জ্ঞানের পরিধি দেখে তিনি একবারেই মুগ্ধ হয়ে পড়েন । সাক্ষাতের পর একজন জাপানী বৌদ্ধ পুরোহিত তোকুনো ওদার উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে তেন্‌শিন বিবেকানন্দের ভূয়সী প্রসংশা করেন ।

「師は気魄学識超然　抜群一代の名士と相見え五天到る処師を敬慕せざるはなし

．．．師はまた英語を能くし　泰西最近の学理にも通じ　東西を湊合して不二法門を説破す　議論風発古大論師の面目あり　実に得難き人物と存じ候　出来得べくんば小生帰朝の際同伴致すべき考へに候」

(গুরুজী(বিবেকানন্দ) অপূর্ব চেতনায় ও জ্ঞানে। তিনি হয়ত বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব । এমন কেউ নেই যে তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না । ... তিনি চমৎকার ইংরেজি জানেন। পাশ্চাত্যের সর্বশেষ পড়াশোনার ফলাফলও তাঁর নখদর্পণে । তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের ধারণা একত্র করে অদ্বৈতবাদ নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন । তাঁর মধ্যে সব পবিত্র উপাখ্যানের বিস্তারিত ধারণা সম্বলিত প্রাচীন মুনীষীর চিত্র যেন দেখতে পাই । তাঁর মত লোক কদাচিৎ পাওয়া যাবে । আমার দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় সম্ভব হলে তাঁকে সঙ্গে করে জাপানে যাওয়ার ইচ্ছা আছে আমার ।)

এই চিঠিতে তেন্‌শিন জোর দিয়ে বলেন যে ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের দুজনের ধারণা সম্পূর্ণভাবে মিলে গেছে ।

「而して師は大乗を以て小乗に先んじたるものと論じ　目下印度教は仏教より伝承せることを説き　釈尊を以て印度未曾有の教主となせり．．．思ふにヴィヴェカナンダの不二法門は全然大乗ならん」

(অধিকন্তু গুরুজী যুক্তি দেখান যে হীনযানের আগেই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে । তিনি এও বলেন যে বর্তমান হিন্দু ধর্মের ধারার উৎসে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম এবং তিনি ভগবান বুদ্ধকে ভারতের শ্রেষ্ঠতম গুরু হিসাবে দেখেন । ... আমার মনে হয় তাঁর অদ্বৈতবাদের ধারণা মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় ।)

বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে তেন্‌শিনের গভীর আগ্রহ ও ধারণা ছিল । শিক্ষা মন্ত্রকে চাকরি করার সময় কিছু দিন নাম করা পুরোহিতের কাছে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে সাধনা করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর । তবে অন্য দিকে চীনের তাওবাদের দ্বারাও ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট ছিলেন তিনি । অর্থাৎ তেন্‌শিনের ধর্মীয় মূল্যবোধ নির্দিষ্ট কোনও ধর্মে সীমাবদ্ধ না হয়ে বরং ধর্মের সার্বজনীন দিক নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল বলে অনুমান করা যায় । আর এ দিক দিয়ে হয়ত তাঁর ধারণা বিবেকানন্দের ধারণার সঙ্গে মিলে গেছে ।

সেই সময় তেন্‌শিন তোকুনো ওদার সঙ্গে কথা বলে কিয়োতোতে "প্রাচ্য ধর্ম সম্মেলন" অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখছিলেন । আর তিনি চান, স্বামী বিবেকানন্দ এই সম্মেলনে যোগ দিন । তথাপি ১৯০২ সালের জুলাই মাসে বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের কারণে তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হয় নি । অধিকন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাচ্য ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠান করাও সম্ভব হয় নি ।

তেন্‌শিনকে যে কারণে শিল্পকলা বিদ্যালয়ের প্রধানের পদে ইস্তফা দিতে হল, সেই চারুকলা শিল্প জগতের ক্ষমতার লড়াই এবং ব্যক্তিগত কেলেংকারী ঘটনার ফলে জাপানে বেশ কিছু লোক তাঁর সমালোচনা করত। প্রাচ্য ধর্ম সম্মেলনের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পর তাঁর সমালোচকরা আরও মুখরিত হয় । তারা বলত যে তেন্‌শিনের দায়িত্ব জ্ঞানের অভাব রয়েছে ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাদের এই সমালোচনা যে একেবারে ভিত্তিহীন ছিল তা নয় । তেন্‌শিন ছিলেন বিশিষ্ট একজন চিন্তাবিদ ও চারুকলার সমালোচক, তাতে কোনও সন্দেহ নেই । তবে অন্য দিকে বাস্তব ও পার্থিব কাজ চালাতে গিয়ে মাঝেমাঝে তাঁর দক্ষতার অভাব ধরা পড়ত । এছাড়া তিনি প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়তেন । আগ্রহ নিয়ে কিছু শুরু করার পরে যখন বুঝেছেন পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে নয়, তখন তিনি অল্প দিনের মধ্যেই আগ্রহ হারিয়ে হাল ছেড়ে দিতেন এবং নতুন কিছু খুঁজতে থাকতেন যা নিয়ে তিনি আগ্রহ সহকারে কাজ করতে পারবেন । তেন্‌শিনের পাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু লোক এ-রকম সাক্ষ্য রেখেছেন ।

তাঁর প্রথম ভারত সফরের প্রাক্কালে তেন্‌শিন ঠিক সে রকম পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন । বিজুৎসুইন প্রতিষ্ঠা করার পর সেটি চালানোর ব্যাপারে আর্থিক অসুবিধা দেখা দিল । এমন সময় হঠাৎ তিনি ভারতে চলে গিয়েছিলেন । তেন্‌শিনের গবেষকদের মধ্যে অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে বাস্তব কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুখ ফেরার জন্য তেন্‌শিন ভারতে যেতে চেয়েছিলেন ।

তা সত্ত্বেও, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ভারত সফর তেন্‌শিনকে নতুন জগৎ দেখার যে চমৎকার সুযোগ প্রদান করেছিল, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে । কোনও সন্দেহ নেই যে কিঞ্চিত সময়ের জন্য হলেও বিবেকানন্দের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারাটা তেন্‌শিনের কাছে বড় আনন্দের ঘটনা ছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার ঘটনা সম্বন্ধেও একই কথা বলা যাবে ।

ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে তেন্‌শিনের মনে একটি ধারণা উঁকি মারছিল । সেটি ছিল এমন ধারণা যে চারুশিল্পের ক্ষেত্রে এশিয়া বা প্রাচ্যের জগতে অভিন্ন এক ধারা অতিবাহিত হয়ে থাকে ।

১৮৯৩ সালে, যখন তিনি টোকিও শিল্পকলা বিদ্যালয়ের প্রধানের পদে আসীন ছিলেন, তখন তিনি ৫ মাস ধরে চীনের বিভিন্ন জায়গায় যান গবেষণা অভিযান চালানোর উদ্দেশ্যে। এই সফরের মাধ্যমে উল্লেখিত ধারণা তাঁর মাথায় জায়গা করে নেয় ।

১৯০১ সালে টোকিওর নিহোন বিজুৎসুইন-এ মাক্‌লাউডদের সামনে তেন্‌শিন যে বক্তৃতা রেখেছিলেন, তার বিষয় ছিল জাপানী ও প্রাচ্যের শিল্পকলার ধারা । ভারতে যাওয়ার সময় তিনি এই বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন । ভারতে প্রায় এক বছর অবস্থান করে তিনি বৌদ্ধ গয়া, অজন্তা এলোরা ও দিল্লীর মত জায়গা ঘুরে বিভিন্ন পুরোনো শিল্পকলার নমুনা পরিদর্শন করেন । এভাবে ভারতের শিল্পকলার ধারা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করলেন তেনশিন ওকাকুরা । এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি তাঁর লেখায় চূড়ান্ত রূপ দেন । বিবেকানন্দের আরেক জন বিদেশী শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা (Elisabeth Margaret Noble)–র সহযোগিতায় পাণ্ডুলিপির সংস্কার সাধন করা হয় এবং সেটি লণ্ডনে পাঠানো হয় । পরের বছর ১৯০৩ সালে তেন্‌শিনের এই রচনা জন মারে(John Murray) নামক প্রকাশনা থেকে বই-এর আকারে প্রকাশিত হয় । বই-এর নাম "The Ideals of the East" অর্থাৎ "প্রাচ্যের আদর্শ ।"

পরবর্তীকালে প্রকাশিত তেন্‌শিনের অন্যান্য বই, যেমন The Awakening of Japan এবং The Book of Tea-র সঙ্গে বইটি অবদান রেখেছে সংস্কৃতির জগতে জাপানের মানসিকতার বৈশিষ্ট এবং এ ক্ষেত্রে অন্যান্য এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে জাপানের নিবিড় যোগাযোগ সম্বন্ধে বিশ্ববাসীদের ধারণা দিতে । সেই সঙ্গে ইংরেজিতে লেখা এই সব বই-এর মাধ্যমে বিশ্ব জানতে পেরেছে যে জাপানে তেন্‌শিন ওকাকুরা বলে একজন উত্তম সংস্কৃতমনা ব্যক্তি আছেন ।

"The Ideals of the East" শুরু হয় সেই অতি প্রখ্যাত মন্তব্য দিয়ে . . . "Asia is one."

এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যে বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদের ধারণাকে সম্ভবত প্রতিফলন ঘটাতে যে চেয়েছিলেন তেন্‌শিন ওকাকুরা, সেইভাবে চিন্তাভাবনা করে হয়ত তেমন বড় ভুল করা হবে না । ■

References:
Tenshin Okakura Kakuzo by Rikoro Kiyomi
Okakura Tenshin by Makoto Ooka
Okakura Tenshin Shu edt. Takeshi Umehara
Okakura Tenshin Sono Uchinaru Teki by Seicho Matsumoto
Okakura Tenshin no Shiso Tanbo by Takahiko Tsubouchi
Okakura Tenshin Zenshu 1st volume published by Heibonsha
Okakura Tenshin to Izura edts. Yoshiyuki Morita, Shinya Koizumi
Okakura Tenshin Album edt. Sunao Nakamura
Swami Vivekananda: Sono Shogai to Goroku edt. Vivekananda Kenkyukai
Swami Vivekananda to Nihon by Swami Medhasananda

Swami Vivekananda's Message for Youth

What you think is what you become and young age lays foundation for it

- Swami Nityasuddhananda

(*Swami Nityasuddhananda ji has been the Secretary of the Ramakrishna Mission Hospital, Kankhal, Haridwar, since 1984, having arrived in Haridwar 50 years ago.*)

"My faith is in the younger generation, the modern generation, out of them will come my workers. They will work out the whole problem, like lions. I have formulated the idea and have given my life to it. If I do not achieve success, some better one will come after me to work it out, and I shall be content to struggle."[1]

How much trust Swami had in the youth, is very much obvious from these above lines which he said in an answer to a question as part of an interview. He firmly believed that youths are the most potent catalysts for changing the fate of any nation, and the future of a country rests in the hands of the youths. History is full of such instances wherein all revolutions were brought about by the ignited young minds that had faith in their real selves. He calls weakness a sin and states that the greatest sin is to think yourself weak, the remedy of weakness is not brooding over weakness but thinking of strength.

His soul stirring words have continued to inspire young people for generations and his message is replete with infinite encouragement for young minds to achieve great things. "All great undertakings are achieved through mighty obstacles. Keep up the deepest mental poise. Take not even the slightest notice of what puerile creatures may be saying against you. Arise, awake and stop not till the goal is reached," [2] was his clarion message to young people.

Youth is the most precious time of one's life. The way we utilize our prime time, determines the nature of our coming years. Happiness, success, honour, goodwill all depend on the way one passes his or her youth. Both mentally and physically one has the vigour to take anything in the world when young. One can mould one's entire life recasting the fresh mould into the way one wants.

Vivekananda called upon the youth to fully participate in the modern world while upholding time tested ancient values. He stressed on man making education. "Education is not information that is put into your brain and runs riot there. It is the manifestation of perfection already in man... that education by which character is formed, strength of mind is increased, and the intellect is expanded and by which one can stand on one's own feet. We must have life-building, man-making, character-making assimilation of ideas."[3]

Youth is also an impressionable age wherein we try to model our life following some icon. We are ready to do anything and everything if convinced of the success in the venture. If we get a role model like Vivekananda before us, we get the whole power to transform ourselves and our surroundings. It is a wonderful privilege to get to know the teachings of a youth icon like Vivekananda who could inspire youths from different parts of the world like Margaret Noble (Sister Nivedita), Sister Christine who later took on the noble work of educating young girls in India.

Swamiji taught the youth the ideals of service and selflessness. He wanted his men to live rather than merely exist. He gave them a higher ideal to live freely and very aptly defined the freedom as it should be 'from the senses' and 'not to the senses', thus putting a check before the most vulnerable youth, never to go astray from the chosen path.

The only quality which he wanted youths to possess was 'to feel', be compassionate towards fellow men. This whole world is like a family and one must think beyond the boundaries of caste, creed and sex. In his poem, 'Hold on yet a while brave heart', he encourages the youth to keep trotting on the path of truth, in spite of all blames and blemishes.

No winter was but summer came behind,
Each hollow crests the wave,
They push each other in light and shade;
Be steady then and brave.
The duties of life are sore indeed,
And its pleasures fleeting, vain,
The goal so shadowy seems and dim,
Yet plod on through the dark, brave heart
With all thy might and main.[4]

All good work has to go through three stages. First comes ridicule, then the stage of opposition and finally comes acceptance, says the seer. To the result oriented youths, he laid down three levels of service. Physical, taking care of human body and undertaking activities to ameliorate human physical suffering; intellectual, running schools and colleges teaching man making education and spiritual, the highest level of service. 'Do good' and 'be good' but never ever for name and fame, cautions this cyclonic monk from India who had won over the hearts of thousands at World Parliament of Religions in Chicago way back in 1893 by his opening words straight from the heart, "Sisters and Brothers of America".

Concluding his message to the youth as, 'Each young person can continue to be what he is – a technocrat, a scientist, an engineer or a doctor. There is so much within the circle of our own lives that we could do something about. The idea is to begin with these small changes and eventually build on them. This easily could be the recipe for larger and greater tasks ahead. ■

References :
1 CW : VOL 5 : Interview : the missionary work of the first hindu sannyasin to the west and his plan of regeneration of India : p. 223
2 CW : Vol 7 Epistles Third series p.478
3 CW : Vol 3 p. 3024 CW : Vol 4 p. 390
4 CW : Vol 4 p. 390

On his travels in India, Swami Vivekananda had observed the pitiable situation that while Haridwar, certainly one of the holiest places in India, was completely lacking in medical facilities. As a result many pilgrims, monks and local people used to simply and silently succumb to death once they fell ill. Swamiji resolved to take on this challenge, and on his return from Parliament of Religions, Chicago, sent out one of his disciples to Haridwar to serve the sick. This is the genesis of the Ramakrishna Mission Sevashrama, Kankhal, one of the seven centres founded during Swamiji's lifetime. As the founders' altruistic approach of treatment steadily went on to earn the confidence of locals and veneration from luminaries like Mahatma Gandhiji, Sir J C Bose, Sister Nivedita etc. who visited this centre, it grew over the last 111 years from a single hut to 122 beds in the eighties and has grown so far to become a150 beds multi-specialty hospital in this new century.

Website: http://www.rkmkankhal.org/index.html

Practical Spirituality

An Executive's interpretation of Swami Vivekananda's Teachings

- Suneel Bakhshi

(*Suneel Bakhshi is the CEO of a company in Tokyo and is a member of the managing committee, Ramakrishna Mission Sevashrama, Kankhal.*)

Swami Vivekananda's teachings are of infinite depth and beauty, and have been interpreted by Swamis and by lay scholars already for more than a century. It is my privilege in this brief paper being published in Japan on his 150th birth anniversary, to relate his teachings to examples of "practical spirituality."

While hard to choose from among his profound and prolific teachings, the three below follow logically, at least to my mind, from the metaphysics of the Advaita philosophy:

- in igniting self-confidence in us all from deep well springs of strength within us.
- in the art and value in treating one's work as worship,
- in trusting in the golden rule of concern for others.

We know the power of SwamiJi's thinking and expression moved India in his time, and in the years since, millions have already been touched by his thoughts, either directly or via the great work that continues to be done by the Ramakrishna Mission. I left India a long time ago and have lived so far in seven countries. It is clear to me that once one penetrates the diversity of different cultures, human nature is not only similar, but at its root, identical. Therefore once translated, Swami Vivekananda's insights ought to appeal just as naturally outside India as they do in India. But do they ?

I believe they do, as in my three decades at our company where we employ over 100 nationalities, I have seen these insights translate into daily life and organisational success. In short, I view these as living evidence of spirituality in practice. Let me briefly elaborate.

" The remedy for weakness is not brooding over weakness, but thinking of strength. Teach men of the strength that is already within them. " Swami Vivekananda's thoughts soared and transcended our world, but his words also serve to guide us daily in matters of leadership, of self-confidence, and of team spirit - all of which are critical to the culture of any enterprise.

At our company we recruit young people directly from universities around the world, and via class room, on-line and on-the-job training, teach them the analytical skills they need to succeed in our industry. We also recruit mid career hires from a variety of backgrounds. We meld both cohorts, along with our core long standing employees, into a team defined by our own mission. As a profit seeking enterprise, we are measured by the market by our profit. However, profit is a lagging indicator of the trust the market places on our ability to deliver value sustainably, far into the future, to our clients. Therefore we must measure leading indicators of our own performance and of our role as a contributing entity of the society we are part of. We do so by several metrics, collectively called the "Voice of Clients". This is a scorecard of the value we create in the perception of our clients, which in turn leads us to deliver acceptable returns on the capital entrusted to us by our shareholders.

Any brand, whether personal or corporate, or for that matter a national flag, is a promise to deliver, and so to build our brand, we must become trusted not only by our clients, but by all other stakeholders that can either amplify or diminish that effort - our own staff, our shareholders, our regulators. I have come to believe that among the insights communicated so powerfully by Swami Vivekananda, the three listed above, i.e. belief in the potentially unlimited strength of every individual, concentration on excellence at work for its own sake, and concern for others, all combined in the pursuit of excellence, allow us to feel joy at work. In as much as these keys to success are natural laws, they apply evenly across societies and countries, and the higher the competition in ones' field in the for-profit sector, or the higher ones' aspirations in the non-profit sector, the more obvious the value of these truths to our daily effort.

One might reasonably ask what evidence there is to link these fundamental truths to practical success. From my own life experience I am convinced the universal reality is that a person whose mind is less clouded either by anxieties or by vanities, and is therefore more clearly concentrated on achieving his or her mission in the spirit of the framework described, shortcuts at every moment towards success, with far less energy wasted in self-doubt or in friction with peers and partners. Such people by definition embody excellence and trust, and over time emerge powerfully as natural leaders - in times of peace and prosperity, and even more so in times of crisis.

We employ talented and ambitious people from all over the world, and they would bring their own unique cultural insights to their lives. I would not begin to claim that most would articulate their keys to success in life as I outline above, or that many in our team in Japan would even have heard of Swami Vivekananda. In fact, most would have not. However it is clear to me that as they move through their careers, the skills they need broaden more and more from predominantly technical skills to the wisdom necessary to excel in management of larger teams, businesses, and groups in society. As this happens they all begin to demonstrate to a greater or lesser degree, all three of these universal truths. In doing so, they themselves become increasingly important role models and leaders of enterprises, and whatever faith they profess, to my mind they are in equal measure, all silent ambassadors of Swami Vivekananda. ■

Swami Vivekananda – the Global Icon

- Anirvan Mukherjee

Take up one idea. Make that one idea your life - think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone.

This is the way to success.

(Swami Vivekananda)

In blue sky floats a multitude of clouds -
White, black, of many shades and thicknesses;
An orange sun, about to say farewell,
Touches the massed cloud-shapes with streaks of red.

.....
Below, the sea sings a varied music,
But not grand, O India, nor ennobling:
Thy waters, widely praised, murmur serene
In soothing cadence, without a harsh
roar. (Swami Vivekananda)

This poem ("On The Sea's Bosom") was composed by Swami Vivekananda, sometime around 1900, as his ship was crossing the Mediterranean Sea. The sight of the deep blue sea, extending out to embrace the sky in a distant horizon – awakened the "poet" within him. It was also a moment of joy - for Swamiji was looking forward to returning home – after another successful trip to the West (1899-1900). However all was not well. His spiritual conquests contrasted with ominous developments of a rather non-spiritual nature – his health was gradually declining. By 1901, his heath had declined to the extent that Swamiji was unable to attend the World Congress of Religions (Japan). Long suffering from complications of asthma, diabetes and chronic insomnia – Swamiji finally attained "mahasamadhi" (departure from mortal body) on 4th July 1902, at the young age of 39 – only to attain immortality in return ....

The Speech

"Sisters and Brothers of America, It fills my heart with joy unspeakable... I thank you in the name of the mother of religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects." (Chicago speech – 1893)

In order to understand Swamiji's influence on contemporary thinkers of his time – one needs to revisit the impact of his 1893 speech (Chicago Parliament of World Religions) on the 4000 plus delegates. Annie Besant – a British Theosophist and a conference delegate recalled him as a *"striking figure, clad in yellow and orange, shinning like the sun of India .... A lion head, piercing eyes, mobile lips, movements swift and abrupt. The parliament was enraptured; the huge multitude hung upon his words"*. Another delegate described *"scores of women walking over the benches to get near him"*, prompting another delegate to joke that *"if the 30 year old Vivekananda can resist that onslaught, he is indeed a God!"*.

The Chicago speech literally made him a star overnight and his fame peaked to stratospheric heights. Thanks to the initiative of a group of socialites like Sara Bull, Josephine MacLeod, Margaret Noble - Swamiji's talks in Cambridge and Manhattan became standing-room-only affairs attended by the cognoscenti of the day. It was truly a "Veni, vidi, vici" moment for Swamiji – and he left his imprints not just as a preacher of Vedanta, but in other areas such as – academia, yoga, science and philanthropy. This article tries to highlight a few of them.

Academia

'He is the most brilliant wise man, It is doubtful another man has ever risen above this selfless, spiritual meditation." (Leo Tolstoy)

A speech at Harvard Graduate Philosophical Club on March 15, 1896 impressed the distinguished audience so much that Harvard made an offer to Vivekananda to chair its Department of Philosophy. Not to be outdone – Columbia University made a counter-offer. Swamiji declined both – but his impact remained. Gradually Ivy League Universities started setting up departments and offering courses in Eastern Philosophy.

Yoga

Swamiji is credited with popularizing Yoga in America and other parts of the Western World. Various articles have even gone to the extent of describing Swamiji as the "Pied piper of the global yoga movement". It needs to be mentioned that for Swamiji yoga meant just one thing: "the realization of God".

At the request of his followers – Swamiji wrote a book "Raja-Yoga" while in the US. This is the only book written by Vivekananda in a "book form" – while his other books are compilations of different articles at different times. This book is meant to give an introduction to Yoga for beginners and inspire them to do it.

Interestingly this slim volume offers scientifically

reasoned explanations of the methods and results of active "pranayama" and meditation. This book is still considered to be one of the finest expositions of "yogic philosophy" and a must read for any serious practitioner.

Philanthropy

"It is a greater pleasure and satisfaction to give money for a good cause than to earn it, and I have always indulged the hope that during my life I should be able to help establish efficiency in giving so that wealth may be of greater use to the present and future generations." (John D Rockefeller)

During Swamiji's stay in Chicago (1894) – the billionaire John D Rockefeller heard about this extraordinary Hindu monk who was staying with one of his friends. One day (on impulse) Rockefeller went to meet Swamiji and walked unannounced into his study. Vivekananda was in deep thought and for a while did not even notice him. After a while, looking at Rockefeller, he started telling him a great deal about his past unknown to anyone but Rockefeller himself. Swamiji said that all the wealth he had accumulated was not for him, that he was only a channel and was expected to serve society. Swamiji said," *Why don't you give back to society what you have earned?"*. This irritated Rockefeller and he made it obvious by leaving the room in a huff.

Two weeks later Rockefeller came back to Swamiji. He produced a piece of paper pledging a huge sum of money for a public cause and said, *"You must be satisfied now, and you can thank me for it."* Swamiji didn't even lift his eyes, did not move. Then taking the paper, he quietly read it, saying: *"It is for you to thank me"*. That was all.

This was Rockefeller's first large donation to the public welfare. Shortly after the Rockefeller Foundation was formed and the rest we know is history. For over 100 years, this foundation has supported individuals, institutions and organizations across the world – including funding an unknown scholar named Albert Einstein!

Science:

"I myself have been told by some of the best scientific minds of the day, how wonderfully rational the conclusions of the Vedanta are. I know of one of them personally (Tesla), who scarcely has time to eat his meal, or go out of his laboratory, but who would stand by the hour to attend my lectures on the Vedanta; for, as he expresses it, they are so scientific, they so exactly harmonize with the aspirations of the age and with the conclusions to which modern science is coming at the present time". (Swami Vivekananda)

Often regarded as the "greatest geek who ever lived" Nikola Tesla is known for his inventions & patents in Alternating Currents (AC), Radio waves, X Rays, Hydroelectric Plant, Modern Electric Motor and countless others. In New York Swamiji met Nikola Tesla in a private party head by Sarah Bernhardt – a famous French Actress. Nikola Tesla was struck by Vivekananda's knowledge of physics. Both realized that they had been pondering on the same thesis of energy in different languages. Vivekananda was keenly interested in the science supporting meditation and took active interest in Tesla's pioneering research in electricity.

The interaction with Swamiji stimulated Tesla's interest in Eastern Science – to the extent that he started using Sanskrit terminology in his descriptions of natural phenomena. For example Tesla began using the words "Akasha", "Prana" and the concept of a luminiferous ether to describe the source, existence and construction of matter.

Japan

"Japan to me is a dream — so beautiful that it haunts one all his life " (Swami Vivekananda)

It is well known that Swamiji visited several cities in Japan (Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, Nagasaki) in 1893, en route to the United States. He was extremely impressed not only by their cleanliness and neatness but by their movements, attitudes and gestures – which he found to be "picturesque". After returning back to India he exhorted large numbers of Indians to visit Japan every year – in order to overcome "centuries of superstition and tyranny".

Swamiji's interaction with the Japanese scholar Tenshin Okakura Kakuzo (author of "The Book of Tea") deserves some mention. Okakura first heard about Swamiji from Josephine MacLeod who encouraged him to visit India and meet him. Eventually Okakura arrived in Kolkata on Jan 6th 1902 and met Swamiji on the same day. During his stay in India (1901-1902) he developed a friendship with Swami Vivekananda. Josephine MacLeod's biography mentions of the special warmth between them – Swamiji refers to him as *"It seems as if a long lost brother has come"*. In return Okakura, in his letter to the Buddhist monk Tokunou refers to Swamiji as *"...the master [Vivekananda] is a truly distinguished person bestowed with surpassing spirit and wisdom and everybody here venerates him...."*. The philosophical discussions between them centered around the importance of the idea of "Advaita" and on "Mahayana Buddhism".

Trivia

My sweet Lord
I really want to see you
Really want to be with you
But it takes so long, my Lord ... (George Harrison)

Little is known of the fact that the famous Beatle George Harrison was a lifelong devotee of Swami Vivekananda. His song "My Sweet Lord" still remains the most popular composition of his post-Beatles career and is consistently ranked on Rolling Stones list of "the 500 greatest songs of all time". Asked about the origins of this song – George Harrison replied that the *"song really came from Swami Vivekananda – who said "If there is a God we must see him. And if there is a soul we must perceive it"*.

12 Jan 1863

12 Jan 1863 must have been another cold day in Kolkata – but not for the aristocratic Dutta household in Simla Street – where a boy - Narendra Nath Dutta ("Naren") was born. A full 150 summers have passed since – and "little Naren" became Swami Vivekananda – an icon for mankind.

Happy Birth Anniversary, Naren !! ■

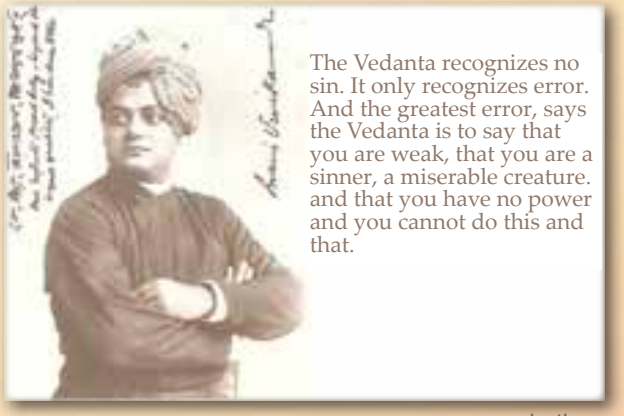

Swami Vivekananda, India and the World:

A Sesquicentennial Tribute

- Srikanta Chatterjee

[*Srikanta Chatterjee is an Emeritus Professor of Economics at Massey University, New Zealand.*]

Introduction

The year-long celebrations of the150th birth anniversary of Swami Vivekananda have been underway all over India and in many other places around the world since January 2012 and will culminate around 12th January 2013, the date of his birth. A towering figure of the Indian renaissance, Vivekananda played a historic role in asserting India's spiritual heritage at a time when, after centuries of foreign rule, India's spirit was at distinctly low ebb. He is rightly regarded as one of the builders of modern India. Although Vivekananda's reputation as a renaissance figure is that of a philosopher and spiritual leader, his influence pervades many other aspects of India's national life, as I elaborate briefly below.

India's Long History: a Perspective

The advent of British rule in India in the second half of the 18th century brought a degree of social and political stability after a long time. Over the next century, the British turned India into a single administrative unit. A consequence of immense significance of British rule in India had been its imperceptible influence on the minds and hearts of India's intelligentsia. The ideas of European Enlightenment were like a breath of fresh air to the stale and fossilised social and cultural environment of the country. As British rule in India started in Bengal, with Calcutta as the capital, it was the Bengali elite who first experienced this transition. The Indian Renaissance started in Bengal in the second half of the 18th century and gathered momentum through the 19th century. Raja Ram Mohan Roy (1772-1833) is regarded as the pioneering figure of this new age. The untiring zeal with which the Raja pursued his mission to modernise Bengal inspired a large number of young people to follow up on the works he had initiated in different fields of human endeavour. The messages gradually spread to the rest of India, and the old social order started to change noticeably.

India's Cultural Resurgence

The changes alluded to above involved both an acceptance of European ideas and also asserting belief in many of India's own age-old philosophical, religious and cultural traditions. The evident scientific and technological superiority of the 19th century Europe had caused Indians to feel a sense of inferiority. The work of the Christian missionaries in particular made the Hindu practice of idolatry and its many attendant rituals look distinctly out of place in a 'modern' society. Although conversion from Hinduism to Christianity was never large scale, the Hindus' pride in their heritage did suffer a set-back. While the advances in the fields of language, literature, education and social reform achieved under the leadership of the renaissance stalwarts from Ram Mohan Roy to Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were impressive, the Hindu religious and spiritual practices continued to face criticism as being outmoded and superstitious. To re-assert her rich spiritual and philosophical heritage India needed a champion who was proud of that heritage, without being conceited; one who had the intellectual conviction and ability to explain it to those who debunked it both within India and outside. In the person of Swami Vivekananda (1863-1902) India found that champion.

Vivekananda's Early Life

Swami Vivekananda's real name was Narendranath Datta or Naren for short. He was born into a well-to-do professional family of north Calcutta on 12th January 1863. His father, Biswanath Datta, was a successful lawyer and a liberal, progressive man in his social and religious outlook. His mother, Bhuvaneswari Devi, was a pious woman of strong personality. Narendranath had wide intellectual interests and an alert mind. He studied widely in history, philosophy, religion, literature and other subjects. He trained in Indian classical music and was a good singer. From his childhood, Naren had a prodigious memory, and could learn and remember a subject easily and quickly. He had a good physique and was a capable athlete. He was always critical of social and religious practices such as caste distinction and untouchability. He wanted to be guided only by reason and proof. Naren attended the Metropolitan Institution, a school founded by Ishwar Chandra Vidyasagar.

After completing school, Naren joined the Scottish Church College (then called the General Assembly's Institution) and graduated with a BA degree in 1884. His favourite subject was history, but he was very widely read in Western philosophy and logic and the history of the European nations. He took a particular liking for John Stuart Mill and Herbert Spencer and regarded himself as an agnostic He even took a course in western medicine to understand the working of the nervous system and its relation with the spinal cord. This helped him later in life to explain the physical and psychic aspects of Yoga in a scientific manner. He was however on a spiritual quest to understand life and its purpose.

Naren's Spiritual Quest and his Meeting with Shri Ramakrishna

His dislike for the ritual-based orthodoxy of the traditional Hinduism led him to join the Brahmo movement, which was a splinter group from mainstream Hinduism, led by such eminent Calcutta personalities as Kesab Chandra Sen and Devendra Nath Tagore. The Brahmo Samaj, as this movement came to be called, was opposed to idolatry. It espoused monotheism in line with the teachings of the Upanishads, the ancient Hindu philosophical texts. Naren was curious about the idea of god, and wanted to know if anyone had personally experienced god. He asked some of the senior Brahmo Samajists if they had "seen god", but their answers did not satisfy him. He continued seeking the truth in an unhappy state of mind.

Meanwhile, a simple man of faith - a priest at a temple in Dakhsineswar, near Calcutta, named Shri Ramakrishna (1836-

1886), had been attracting attention because of his unorthodox manner of practising religion and his rejection of ritualistic practices. An English professor of Naren's college, William Hastie, mentioned Ramakrishna's name while discussing Wordsworth's nature-mysticism. Hastie observed that such mystical experiences can be gained through deep meditation, adding that he considered Ramakrishna, whom he had met, to be one who had achieved such a state through concentration and pure living.

Naren's first meeting with Ramakrishna was at the home of Surendra Nath Mitra, a wealthy and influential Calcutta figure, who invited Naren to sing for his guests at his home. The guests included Ramakrishna. This was in November 1881 when Naren was just 18 years old. Ramakrishna exchanged a few words with Naren and eagerly invited him to visit Dakshineswar. Naren's first impression of Ramakrishna was one of scepticism and confusion; but he could not ignore the simple priest of Dakshineswar.

A few months later, Naren's cousin Ram Chandra Dutta took him and a couple of other friends to Dakhineswar. Ramakrishna was ecstatic to see Naren, took him aside and told him that he had missed Naren badly ever since their first meeting. Naren was, again, not sure how to take this strange man; his immediate reaction to such behaviour was one of bewilderment! But, later, this is how he recollected his experience:

He [Ramakrishna] used the most simple language, and I thought 'Can this man be a great teacher'? - crept near to him and asked him the question which I had been asking others all my life: 'Do you believe in God, Sir?' 'Yes', he replied. 'Can you prove it, Sir?' 'Yes'. 'How?' 'Because I see him just as I see you here, only in a much intenser sense'. For the first time, I found a man who dared to say that he saw God, that religion was a reality to be felt, to be sensed. ..... When I saw this man, all scepticism was brushed aside.

While Naren was fascinated to watch Ramakrishna's ability to enter into different states of consciousness and to induce others, including Naren himself, into them, his rational mind could not accept Ramakrishna's worship of the idol of goddess (Mother) Kali. However, he continued visiting Ramakrishna, and learning from him.

In 1884 both Kesab Chandra Sen and Naren's father Biswanath Datta died within a month of each other. Naren experienced the most serious spiritual crisis, and decided to renounce the material life and follow the path of religious life, with Ramakrishna as his Master. By then he had observed the idol-worshipping priest proclaiming with complete conviction, 'যত মত, তত পথ' (as many pathways to god as there are faiths). This affirmation of non-sectarian belief satisfied Naren's rational mind.

Ramakrishna himself died of throat cancer in 1886. Vivekananda had received many spiritual and psychic benedictions in the form of extraordinary experiences from his Master. He was ready to explore his own ideas in the contemporary context of his motherland in a state of material destitution and spiritual confusion.

Narendra Reconciles Reason with Religion

So, what was to be the aim of Naren's religious pursuit? Was its purpose to be his personal salvation? Naren had never been a believer in rituals or blind observance of some practices. He would insist on being guided always by rational judgement. How could he reconcile reason with religion? Again, he found the answer in the words of his Master that 'religion did not work on an empty stomach'. The main point of Ramakrishna's teaching was that 'the service to man was service to god'. This accorded fully with Naren's rational and practical mind, and he was ready to preach it to the world, and to put it into practice.

The misery and wretchedness of his countrymen made Naren determined to practise religion that helped deal with these practical problems. "I do not believe in a God or religion which cannot wipe the widow's tears or bring a piece of bread to the orphan's mouth", he observed. He found the answer to his quest for such a religion in the philosophy of *Vedanta,* which is one of the six Indian philosophical systems. Vedanta, based on the monotheistic idea of *Brahma*, the supreme godhead, teaches that religion is the manifestation of the Divinity already in man. It proclaims that *atman*, the Absolute Soul, is the only ultimate reality in the metaphysical sense. Since all objects are manifestations of god, serving fellow men, especially the poor, was the Vedantic way to practise religion for Naren. He called it 'practical Vedanta'.

After Ramakrishna's death, the small group of his direct disciples had gathered to form a kind of a movement that was later to spread across India and the world to spread the Master's teachings, and, more importantly, to serve humanity in need. Several of the young disciples took the monastic vows and assumed monastic names (ending with 'ananda' or bliss). All this was achieved under Naren's informal leadership, but he himself had not adopted a monastic name at this stage. The monks then set off on extended pilgrimages visiting the Hindu holy places all over India and living the monastic life. Naren too was travelling, usually alone, but sometimes with some of the other monks, using various assumed monastic names to hide his worldly identity. It was in 1892 that he came to assume his monastic name Vivekananda (one who has the bliss of spiritual discrimination), and Swami as the title. This name was apparently suggested by the Raja of Khetri, one of his major benefactors in Rajastan. His travels over five years from the southern tip of India to the high Himalayas helped Vivekananda to perceive at first hand the enormity of India's social, economic and religious problems. It also helped him to chart the future path or the mission of the movement he was to lead. He was ready for action.

Swami Vivekananda in the West

In September 1893, a Parliament of Religions was being held in Chicago. Although most of its participants were Christians of different denominations, there were several Asian delegates representing some of the Eastern religions. Vivekananda (Swamiji) arrived in Chicago uninvited and penniless, but through a series of unusual coincidences, he was able not only to attend the Parliament but also to speak. He started his speech with the words "Sisters and Brothers of America". This seemed to capture the spirit of the religious gathering, and it received a long and enthusiastic applaud. After the brief opening speech, the Swami spoke a few more times on themes such as "The Essence of the Hindu Religion" and "Religion Not the Crying Need of India". He summarised Hinduism's basic teachings in a manner that was at once elegant and intelligible. He also mounted a spirited attack on the Western tendencies to distort Indian religious and social practices. He proudly asserted the "tradition of tolerance and universal acceptance" of the Hindu religion; recalled its history of granting refuge to the persecuted minorities such as the followers of the Zoroastrian faith and also the Israelites who had "come to Southern India in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny".

His dignified and inspired presence in the orange garb of a *sannyasin*, his oratory, delivered in measured and perfect diction, and his message asserting the essential similarity of all religions made him an instant celebrity. He chastised the Christian missionary's relentless mocking of Hindu idolatry by reminding them that "every man in Christian countries has a huge cathedral on his head, and on top of that a book". "The range of idols, he pointed out, is from wood and stone to Jesus and Buddha". He proclaimed with conviction that there was divinity in all men, that the Vedantist saw "no difference between ant and angel; that every worm [was] the brother of the Nazarene". And yet, this Swami was equally assertive in saying at this religious gathering that "India's true need was

not an alien religion, but food, medicine and financial assistance to cope with her massive problems".

Following the Parliament, he was so much in demand that Swamiji spent over two years lecturing at various places across the United States, taking only a brief break to visit England in 1895. His lectures on Vedanta and on religion generally were equally well-received in England. He gathered some disciples too, among them was Margaret Noble, the future Sister Nivedita, who devoted herself to the task of helping the poor in India as part of the Ramakrishna movement. The Swami visited England a second time when returning to India in 1896. On this trip, he visited several other countries in Europe. He had earlier visited China, Japan and Canada.

The scholarly manner in which the Swami had been conducting his discourses had led to two offers of professorship – from Harvard and Columbia Universities. He declined both because paid work was not for him, a sannyasin. During his stay in the USA, he was able to found the Vedantic Society of New York as a non-sectarian organisation for preaching and practising the principles of Vedanta and applying them to other religions. A similar organisation was also founded in England. These have since developed into larger bodies, with branches in other parts of the America and Britain.

Vivekananda's messages for India

A keen and life-long learner, Vivekananda observed and learnt a lot from his travels in the West, and returned to India to tell his compatriots to "sit at their [the Westerners'] feet and learn their arts and industries". He castigated them for their bigotry and their backward thinking. "Go back to your Upanishads, the shining, the strengthening, the bright philosophy; and part from these mysterious things, all these weakening things". His guru Ramakrishna's uniquely syncretic belief inspired Vivekananda to proclaim that India's future greatness would issue out of the combination of Islam's idea of brotherhood with Vedanta's intellectual understanding of life: "an Islamic body and a Vedantic brain", as he put it. He mocked the narrow-minded attitude of his fellow Hindus: "our religion is in the kitchen, our God is the cooking-pot, and our religion is "don't touch me, I am holy". His messages to India were those of self-reliance, individual search and effort, and compassion for the poor and the down-trodden. Above all, he preached fearlessness. "If there is a sin in the world, it is weakness; avoid all weakness, it is sin, it is death", he told his countrymen. His influence was like a "tonic to the depressed and demoralised Hindu mind and gave it self-reliance and some roots in the past", observed Jawaharlal Nehru.

The Ramakrishna Mission: the Organisation for Humanitarian Work

The idea of service to the poor which Vivekananda had adopted as the aim of his religious work prompted him to develop what has emerged as the Ramakrishna Mission, with branches in a number of centres around India and in some centres around the world. Vivekananda himself planned and founded the first few of these bodies between 1897 and 1899. Many monks considered self-realisation and not humanitarian activities as their appropriate goal. But Vivekananda, the believer in practical Vedanta, considered serving god through serving humanity as more relevant in a world full of misery and suffering. The humanitarian work that the Mission has been doing ever since its establishment has been its greatest contribution; it has made the organisation what it is both in India and elsewhere. The spiritual aspects of the Mission are there for those who wish to pursue a spiritual life, but Vivekananda's call was to work for the poor.

Vivekananda's Legacy

Ever since the Parliament of 1893, Vivekananda's life had been one of ceaseless activities teaching the essential lessons of Yoga and of the Upanishads, and organising the Ramakrishna Mission which was to be the instrument to carry the message of love, compassion and service to the poor that Ramakrishna had taught him. When he returned to India in 1900 from his second visit abroad, he was exhausted and in poor health. As a true Yogi, he was introspective and without personal attachment to his surroundings and his many achievements. With moving candour he observed:

Behind my work was ambition, behind my love was personality, behind my purity was fear, behind my guidance the thirst for power. Now they are vanishing and I drift.

It appeared as though he was mentally ready to depart from this life. He had relinquished his various duties and responsibilities around the Mission and its head office in Belur, Howrah. Vivekananda passed away on 4th July 1902, at the age of 39. How is one to remember him? He was not a "holy man" in the conventional sense. He was a crusader in the cause of uplifting the material conditions of the poorest of the poor in a completely non-sectarian way. He was unforgiving of the heartlessness of some of India's social practices. And yet, he was full of pride in India's eternal gift to humanity, the wisdom of the Upanishads. ■

[*Some information sources: extensive use has been made of the following books: Christopher Isherwood, Ramakrishna and His Disciples; Carl Jackson, Vedanta for the West; VKRV Rao, Swami Vivekananda; Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, and Swami Vivekananda, My India: The India Eternal*]

Youth & Swami Vivekananda

- Akash Dutt

"Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there, undigested, all your life. We must have life-building, man making, character- making assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library."

By: Swami Vivekananda

Swami Vivekananda's main concern was to help individuals to grow and evolve; to develop an all-round personality. To develop an all-round personality means good education, not only information but moral education which consists a strong body, strong mind, clear conscience and spiritual consciousness. It is only if the individual develops all these then the society can become better. In order to help others to develop their personalities and to provide character making moral education, we have to develop ourselves in the first place! "Be and make", says Swami Vivekananda, "Be God and help others to become God". A total transformation has to take place first of all in ourselves, only then can we help others to transform themselves. The future of humanity and our country lies in hands of youth, which are in great influence of west and their materialistic thoughts. West have struggled in outer world and achieved technology and methods and east have struggled in inner world and achieved peace and love.

Supposing if someone wish to develop a good physique and become an athlete, he/she will have to approach expert athlete and good institutions or training centers. From them you can learn the techniques required for becoming an athlete. Then you will need to attend different methods and to practice those techniques. With steady practice, in due course of time, you are bound to become a good athlete. Similarly if we wish to develop a good education system for young, then we need people of strong character, who can help forming good education institutes of repute. The idea is again the same. First we have to develop and maintain close contact with persons who have themselves developed such all- round personality (teachers/ mentors). From them we will have to learn the technique of faith and feeling, which is the main secret of assimilating ideas into our life. Within a considerable period of time we will bring about a revolutionary transformation in our current education system and thought process.

West and east have to walk together otherwise; it will be very difficult to form a country with people of strong character and advanced technology. As "Every idea that strengthens you must be taken up and every thought that weakens you must be rejected", that's why contribution from each and every part of world is required. Whatever of material power we see manifested by the western races is the outcome of faith, because they believe in their muscles and methods, where the spiritual growth of east and their ideas is only possible because of strong faith in themselves. That nothing can destroy, in it is infinite power only waiting to be called out.

Now how can we develop a moral building education system or a character making education? This can be done by youth with higher dimensions of character and values in its true sense. Thus a person identified only with the physical dimension without exercising his higher mental ideas and thoughts, lives not far different from animals, whose pleasures and pain are restricted to the sensory system. Men making education involves development with struggle from one's lower mind absorbed by desires, old habits, wrong tendencies, impulses and bad impressions. The lesser we identify with the lower mind or worldly mind, and the more we identify with the higher mind /thoughts, and we can exercise our Vivek (discrimination between right and wrong), the more strong our character will become.

Rather than filling minds with lot of information and thoughts, first one needs to learn as how to use your brain and mind. What should be the correct thought process, as from data which information is to be picked and which is not? Before learning all these, in our current education system we start feeding data to young. Even we teach a small child about how to talk, walk and etiquettes, but we don't teach him/her how to think. What should be our thought process, and how we can develop art of learning with a calm and ignited mind filled with true knowledge? Development can only took place with absolute Faith on soul or infinite potential, positive thoughts, attitude towards failures, mistake and success, self reliance and most important service and responsibility. We have to nourish unconditional service and love towards nation, society and people. Swami Ji once said "give me few men and women of character and strong moral I will change the world".

We must include practical service in our modern education, so young can learn that what good we are if we are not able to help a poor or needy, what educated I am if can't make my country my people stand with head held high. We must learn our various ancient art of yoga, Pranayam (respiration techniques) and Meditation. We must learn the art through actual masters on conserving there precious energy of life in young age and how they can channelize it towards good of society and people. We must learn that pleasure is not the goal of life but to attain eternal bliss and happiness through devotion and service. Children must be taught from history that people who are of strong character are honored and those who have just lived to acquire wealth have become dust of past. Live a life with all comforts, eat healthiest and purest food, have good physique, nourish yourself with energy and very strong intellect, so we can question the darkest corner of the world and become a live lamp that will guide hundreds, thousands of men from worldly misery to fearless wisdom. The time has come this hour and very minute, stand up and fight! Not one step back, that's the idea, we must stand up all together to be a change to bring change in education system.

Swami Vivekananda has given wonderful ideas on all aspects of character making especially for youth and its overall development. These ideas are very practical and very easy to implement just there is a need to manifest these ideas into current stream of education. We become, not just well informed and clerical, but responsible with strong characters to perform duties with fire in belly and utmost faith and energy from purity of soul. ■

"Be obedient and eternally faithful to the cause of truth, humanity and your country, and you will move the world."

By: Swami Vivekananda

Swami Vivekananda on Brotherhood

- Hemalatha Anand

Swami Vivekananda's inspiring personality was well known both in India and the rest of the world in the last decade of the 19th century and the first decade of the 20th. This young unknown monk of India suddenly leapt into fame at the 'Parliament of Religions' at Chicago in1893, at which he represented Hinduism.

This year as we celebrate the 150th Birth centenary of Swami ji , His century old message of universal brotherhood and tolerance is still more apt than ever for the "globalized village" that our world is becoming today .

In his opening address at Chicago, he addressed his audience as " Sisters and Brothers of America" . Instantly thousands arose in a thunderous applause! They were deeply moved, to see at last a man, who spoke to them with the natural and candid warmth of a brother. The keynote of Swami ji's address was universal toleration and acceptance. His mission was both National and International. A lover of mankind, he strove to promote peace and brotherhood on the spiritual foundation of the Vedantic oneness of existence.

What is Brotherhood? It does not merely mean kinship, association, fraternity or fellowship. It is the basic idea of the Vedanta and it is this Vedanta that was preached by the Master. The Vedanta conveys but one great idea-the solidarity of this universe and universal brotherhood. These ideas of Universalism and Spiritual Brotherhood are in the air today. But each man consciously or unconsciously seeks them to his own profit. Each one cries-"Universal brotherhood! We are all equal-therefore let us make a sect." As soon as the sect is made, there is a protest against equality and equality is no more!

The Master says," Do not be deceived by these words for behind this talk is the most intense selfishness. In the winter sometimes, a thundercloud comes up. It roars and it roars, but it does not rain. In the rainy season, however, the clouds speak not, but deluge the world with water." So also those who are really workers and really feel at heart the universal brotherhood of man, do not talk much-do not organize leagues- they work and they live.

Diversities of rituals, myths and doctrines do not trouble them. They feel the thread passing through them all, linking them like pearls to a necklace. Like the rest they go to draw water from the well, each with his own pitcher, whose form is taken by the water. But they do not quarrel about the form. They know that it is all the same water!

Unity in variety is the plan of the universe. We are all men and yet we are all distinct from one another. As a part of humanity I am one with you. As Mr. or Ms. So and so I am different from you. As a man you are different from an animal. But as living beings, man, woman, plant and animal are all one; and as existence, we are all one with the universe. That Universal Existance is God-the ultimate Unity in the Universe, and in Him, we are all One.

For centuries to come, people everywhere will be inspired by Swami Vivekananda's message –

" O man! First realize that you are one with the Bramhan – Aham Bramhasmi- and then realize that whole universe is verily the same Bramhan –Sarvam Kalvidam Bramha ! Lay down all your comforts, your pleasures, your name, fame or position. Lay down even your life and make a bridge of Human chains over which millions will cross the ocean of life. Bring all forces of good together. Do not care under whose banner you march. Do not care what be your colour but mix all colours up to produce the intense glow of white-the colour of love-the love that promotes Brotherhood and oneness." ■

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダの

教えの中にある全地球的なものの見方

－ヴィカース・スワループ

（在神戸インド共和国総領事で作家、国際映画アカデミー祭のオスカー賞受賞作品「スラム街の百万ドル長者」の原作者。）

（次の内容は、二〇一〇年一月二四日、協会創立五〇周年記念関西地区祝賀会において、インド総領事ヴィカース・スワループ閣下がなさった講演の内容を、そのまま掲載させていただくものであります）

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、一九八三年、シカゴでの第一回世界宗教会議に参加するために米国を訪問し、その会議で行った演説によって、世界中にその名声を広めることとなりました。招待されてもいない若い僧侶が、この威厳ある集会で演説をし、聴衆を、まるで電気ショックを与えたかのように感動させました。同師は、この演説において、ある一つの譬え話をされましたが、私は、このお話は、私達の時代、現在においてもなお通用するお話だと思います。

昔々、井戸に一匹のカエルが棲んでおりました。このカエルは、ここで生まれ、ここで育った、小さなカエルでした。だが、時がたつにつれ、このカエルは、この井戸の中の小さな生物を食べ、やがて栄養のよさそうな、肥ったカエルとなりました。ある日、海に棲んでいたもう一匹のカエルがやってきて、この井戸の中に落ちました。

「君は一体どこから来たんだい？」と井戸の中のカエルが尋ねますと、

「僕は、海から来たんだよ」と新しくやってきたカエルは答えました。

「海だって！　それは、一体、どれぐらい大きいんだい？　それは、僕の井戸と同じぐらい大きいのかい？」といって、井戸の端から端へと跳びました。

「友よ」と海からきたカエルは言いました。「一体全体どうやって、海を、君のいるこの小さな井戸と比べることができよう？」

すると、井戸のカエルはもう一跳びして、聞きました。「君の海は、そんなに大きいのかい？」

「海と君の井戸を比べるなんて、なんと君は馬鹿げたことを言うんだろう！！！」

「でも」、井戸のカエルは言いました。「僕の井戸より大きなものなんてあり得るはずがないよ。君は、ウソつきだ。君を放りだしてしまうぞ」と、言ったということです。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、この小さな話を語り、そして、こう言いました。「これが、実は一番の問題だったのです。私は、ヒンズー教徒です。私は、私自身の小さな井戸に座っていて、全世界はこの私のいる小さな井戸だ、この小さな井戸が全世界だと思っています。キリスト教徒は、彼らの小さな井戸に座って、彼らの井戸が全世界だと思っています。イスラム教徒もイスラム教徒で、自分たちの小さな井戸に座って、それが全世界だと考えています」

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師が、今日なお、これと同じ話をしたとしても、少しも不自然ではありません。と言いますのも、私達のまわりで、今なおたくさんの分裂の兆しや憎悪や暴力が見られるからなのです。誰もが、真実を独占しようとし、真実は自分たちだけにあると主張しようとしています。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、続けて言われました。「もし、あの宗教会議が世界に何かを示したとすれば、神聖や純潔や貞節は、世界のいかなる教派の独占所有物でもなく、また、どんな組織や制度であろうと、それぞれ高潔な人格の男性や女性を生み出してきたのだということを、世界にはっきり示したことです」

「宗派主義、偏狭、頑迷、そして、それから派生する恐ろしい狂信主義が、この美しい地球に長い間はびこってきました。これらは、暴力で地球を一杯にし、地球を何度も何度も人間の血で汚し、文明を破壊し、すべての国を絶望の淵にまで追いやってきたのです。このような恐ろしい悪鬼が存在しなかったならば、人間社会は、現在のそれよりも、はるかに進んだものになっていたことでしょう」

人々が文明の衝突について語る現代において、このスワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師のメッセージが、いかに妥当性をもつものであることかが、お分かりになると思います。

これは、彼自身の次の言葉に要約されています。「助け合い、争うことなかれ。同化をこころがけ、破壊することなかれ。不和ではなく、調和と平和とを求めよ」と。

また、有名な英国の歴史家、A.L.バーシャムは、スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師による世界文化への貢献を、次のように言って、評価しています。「今後、何世紀にもわたって、彼は、現代世界を形作った人々のうちの一人として、人々の記憶に永く生きつづけることであろう」と。

スワーミージーの、この現代世界に対する最も意義深い貢献の一つは、彼が、すべての人類が共有する超越的な真の普遍的な経験として宗教を解釈したことにあります。同師は、これを次のような聖歌を通して美しく表現しています。

「それぞれ異なる場所に源をもつ、異なる流れが、海で一緒に混ざりあいます。ですから、神よ、人々が異なる性癖、性向に応じて取る異なる道、これらは多種多様に見え、曲がっていたり、真っ直ぐであったりはしますが、すべては御身へと導かれていくのです」と。

さらに、もっと意味深いことに、スワーミージーは、迷信、教理、聖職者の政略、不寛容さなどの全くない宗教を信じていましたし、宗教と科学は、お互いに矛盾するものではなく、補完性があるものであるとも主張していました。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師の、世界への貢献の二つ目は、人間に対する新たな見方を広めたことにあります。即ち、スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師の、人間の魂の潜在的神性という概念は、新しい、高潔になっていく人間という概念を生み出していきます。現代は、ヒューマニズムの時代、つまり、すべて人間が人々の主な関心事となり、あらゆる活動や思考の中心は人間であると考える時代なのです。

人は、科学や技術を通して、大いなる繁栄と力を得ましたし、近代的なコミュニケーションや旅行といった方法を通して、人間社会を「地球村」にしてしまいました。しかしながら、それと同時に、現代社会においては、壊れた家庭、不道徳、暴力、そして、犯罪が異常に増加しているのが見られ、人間の堕落や退廃が、同時に進行しています。しかし、ヴィヴェーカーナンダ師の説く人間の魂のもつ潜在的神性という概念は、こうした堕落や退廃を防ぎ、人間関係を神性なものとし、人生を意味のある、生きる価値のあるものとします。

スワーミージーは、「精神的人間主義」の基礎を築かれました。この「精神的人間主義」は、いくつかの新しい人間中心主義運動という形をとって現われております。また、世界中で、瞑想、ヨガ、禅、などに、人々の関心が向いてきているということは、私達人間が、一人一人の中にある隠れた神性を顕現していきたいと望んでいる証拠です。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、また、当時、英国の植民地主義のくびきの下でよろよろしていたインド人に、誇りの意識を注ぎ込むことによって、インドの愛国主義思想の形成に多大の貢献をしました。団結意識、過去に対する誇り、使命感、――これらはすべて、インドの愛国主義運動に真の強さと目的を与えた要素であります。インドの独立解放運動の幾人かの卓越した指導者達は、彼らがいかにスワーミージーに負うところが大きいかということをよく知っていました。

独立後、インドの最初の首相となったジャワハールラル・ネルーは、以下のように書いています。「過去に根ざし、インドの名声に誇りをもっていたヴィヴェーカーナンダ師は、人生の問題への取り組み方が近代的であり、インドの過去と現在の間の一種

の架け橋的存在でありました。…彼は、意気消沈し堕落していたヒンズー教徒の精神にとって、気付け薬として現れ、インド人に自己依存. 独立独行の精神と、いくつかの過去のルーツを思い起こさせてくれたのです」と。

また、ネタージー・スバーシュ・チャンドラ・ボースは、「スワーミージーは、東と西を、宗教と科学を、過去と現在を調和させました。そして、それこそが、彼の偉大さの理由なのです。わが国の国民は、彼の教えから、かってないほどの自尊心、自信、自己依存、そして、自己主張の力を獲得したのです」と書いています。

新しいインドの創造に対するスワーミージーのユニークな貢献は、インドの人々の心を、下層の踏みにじられた大衆に対してなすべき義務に向かわせたことであります。カール・マルクスの思想がインドで知られるようになるずっと以前に、既にスワーミージーは国の富を生み出す労働者階級の役割について話していました。スワーミージーは、インドで、大衆のために語り、奉仕の明確な哲学を確立し、大規模な社会奉仕活動を組織した最初の宗教指導者でもありました。

彼自身の言葉で、「何百万人という人々が、飢えと無知の中で生きているかぎり、彼らの犠牲の上で、教育を受け、それでいて、彼らに何らの注意を払わない人を、私は国賊と見なす」とさえ言っています。

また、彼は、「もし、あなたが三億三〇〇〇万の神話の神々のすべてを信じていながら、自分自身を信じていないのであれば、あなたに救いはないでしょう。自分を信じ、その信頼の上に立ち、強くありなさい。これこそが、我々の必要としていることなのです」とも語っています。

そして、最後に「他人のために生きる人々のみが生きているのであり、それ以外の人々は、生きているというより死んでいるのです。純潔であれ、そして、他人に良いことをなせ、これこそがあらゆる礼拝、祈りの要点なのです」とも言っています。

このように、スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、単に、宗教指導者であるだけではなく、愛国主義者であり、社会改革者であり、人間主義者でもありました。今日、経営学院の中には、スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師の教えをとりいれて、教育を全体的な価値に基づいたやり方で行っているところがあります。スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、誰もが教育の機会に近づける可能性を強調されました。師は、「もし、山がモハメッドに近づいてこなければ、モハメッドの方から、山に行かなければならない。もし、貧しい人が、教育に近づくことができなければ、教育が彼らの手に届けられなければならない。田畑であれ、工場であれ、どこであれ、今日教育の方から近づいていかねばならない」とまで言っておられます。

サッチャンドラ・ナート・ボースという方は、インドの有名な科学者で、彼の理論研究に敬意を表して特殊な原子核の集団に彼の名前が付けられたほどですが、その方は次のように言っておられます。「ヴィヴェーカーナンダ師のなかに、私達は、これまで見たことのないような、科学的気質と精神性の見事な統合を見てとることができる。インドは、彼の時代には、このような教育が必要とされていたし、この必要性は、今もなお続いている」と。しかし、スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師が残した最も永続的な遺産は、彼が創立した団体であるラーマクリシュナ僧院とラーマクリシュナ教団、さらにその関係団体としてのヴェーダーンタ協会です。これらの組織は世界中にありますが、非政治的、非宗派的な精神団体で、さまざまなかたちの人道主義的、社会奉仕活動に一世紀以上も関わってきている団体です。放棄と自制と奉仕の理想のもと、僧院や教団の僧侶や一般信者達は、何百万人とおり、男、女、子供、カースト、宗教、人種の区別なく、奉仕を行ってきました。というのは、この様な人達の中にこそ「生きている神」を見るからです。この双子の団体のモットーであるātmano mok ārtham jagad hitaya cha(＝自分自身の救済のため、また、世界の福祉のため)は、これらの団体の使命を簡潔に言い表しています。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、一九八三年、シカゴに行く途中で日本に立ち寄り、大阪にも来ています。師は、当時、世界中で日本人ほど愛国的で芸術的な民族は見たことがないと、言われました。彼は、日本で見たことに感動し、鼓舞され、日本を再び訪れたいと欲していましたが、残念なことに、一九〇二年にたった三九歳で亡くなりました。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師が感動したこの日本において、日本ヴェーダーンタ協会が、同師の志した気高い仕事を続けていのを拝見することは、大変うれしい限りです。

ヴェーダーンタ協会の創立五〇周年記念のおめでたい機会に、貴協会が、日本、そして、全人類のために、さらにいつまでもご奉仕を続けていってくださいますよう、お祈り申し上げます。

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ師は、ヴェーダーンタ協会にだけではなく、インドにとって、また、実際、全世界にとって、「インスピレーション――鼓舞感化を与える人物」です。師は、「あなたは、神を信じることはできません。あなたがあなた自身を信じるまでは」と言われました。わたし達は、彼から、ポジティブシンキング(前向きの考え方)の恩恵を学ぶことができます。師が言われたように、「もし、あなたが災害のことを考えるなら、それがやってくるでしょう。死のことを考えるなら、あなたの死を早めるでしょう。前向きに肯定的に考えなさい。それも、上手に、自信をもって。そうすれば、人生はもっと安泰なものに、もっと活動的なものに、成果や経験の豊かなものになるでしょう」

私達それぞれの人生で、強さ、力を獲得し、世界をよりよい場所にするために、彼のメッセージをよく考えてみましょう。

ありがとうございました。■

老ラビの二人の弟子が神に至る真の道について議論していました。1人が、道は多大な努力とエネルギーを費やして達せられると主張しました。「全身全霊で教えを守らなければならない。祈り、細心の注意を払い、正しい生活を送るのだ」もう一人が反論しました。「達成をもたらすものは努力などであり得ない。それはエゴに基づく考えだ。純粋にお任せすることが必要なのだ。神への道を進むということ、目覚めると言うことは、すべてを手放す、つまり『自分の意志ではなく、汝の御意志のままに』と言うことだ

お互いに合意に達成しなかったので、彼らは師に会いに行きました。師は一人目の弟子が全身全霊で進む道を称えるのに耳を傾けました。この弟子に「これは正しい道ですか」と尋ねられ、「お前は正しい」と言いました。それを聞いてもう一人の弟子はいてもたってもいられず、お任せしてあるがままに従う道が正しいと強く主張しました。そして「こちらの方が正しい道ではないのですか」と尋ねました。師は「お前は正しい」と答えました。

その場に居合わせた3人目の生徒は「でも先生、両方は正しいということはあり得ないのではないですか」と問うと、老ラビは微笑んで、「お前も正しい！」と答えました。

自分の運命を決めなさい

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

– アナンダマイあや訳

種まきと芝刈り

我々人間は、自分の弱さ、欠点を見つけるのにとても時間がかかり、誰かのせいにしている。たいてい、人は、人生の責任のすべてを仲間のせいにしたり、神に押し付けたり、お化けの仕業にしたりして、これが運命だという。どこに運命があるのか？誰が運命なのか？　自分で蒔いた種は自分で刈り取るのである。

我々が、自分自身の運命を作っている。誰も責められたり、讃えられたりしない。風は吹いているのである。帆が張られた船は風を捉え、自らの道を前に進んでいく。しかし、帆の張られていない船は風を捉えることができない。それは風のせいだろうか？慈悲深い父のせいだろうか？　慈悲深い風は、やむこと無く昼も夜も吹き続け、慈悲は力を失うことはないというのに、我々の幸不幸は彼のせいだというのだろうか？　我々が自分の運命を決めている。太陽は強い人にも弱い人にも同じように照らす。風は、聖人にも罪人にも同じように吹きつける。彼は全ての神であり、全ての父であり、慈悲深く公平である。全ての創造物の神が、我々と同じような光のもとで、我々のつまらない人生を見ているというのだろうか。だとしたら、それはなんと落ちぶれた考えだろう！　我々は、子犬のように、生と死をさまよい苦しみ、神さえも我々と同じように地道に取り組んでいると、おろかにも考えている。神は、子犬の戯れの意味をご存知である。我々が、神が罰や褒美を与えると考え、神のせいにしようとするのは、愚かなことである。彼は罰したり、報いを与えたりすることは決してない。神の無限の愛は、いつでも、どこでも、どんな状況でも、間違いなく、揺らぐこと無く、全てのひとに開かれている。それをどのように使うかは、我々次第である。人や神や世界の誰のせいにしてもいけない。もし苦しんでいるのであれば、自分のせいなのだから、良くなるように努めよう。

唯一の解決策

これが問題のたった一つの解決策である。他人のせいにしてしまう人たち――なんてことだろう、日々増え続けているのだが――は、一般的にはどうしようもない事に頭をかかえ、惨めである。彼らは、自分の過ちによってその道に進んでいるというのに、他人を責めているが、そうしたとしても彼らの立ち位置が変わることはない。とにかく、そうすることが彼らの助けになることはない。他人のせいにする試みは、更に自分を弱くしてしまう。従って、自分の過ちを誰のせいにもせず、全ての責任を自分にゆだねなさい。「私が苦しんでいるこの悲惨さは私のもの、まさにこの事実が、私のみによって解決されなければならないだろうということを意味している」ということである。私が生み出したものは、私が壊すことができる。他の誰かが作ったものは、決して私が壊すことはできないだろう。従って、立ち上がれ、勇気をもって、強くなれ。全ての責任を自分に負わせ、自分の運命は自分で作ることを知ろう。望む全ての強さと支援は、全てあなたの内に存在する。従って、自分の将来を作りなさい。「死んだ過去は死んだものとして埋めなさい」。無限の未来があなたの前にあり、いつも言葉、考え、行動は、自分のために蓄えておき、悪い考えや行いは虎のようにあなたに飛びかかってくる用意ができていることを覚えていなさい。そして、良い思考や行いを奮い立たせるような希望が、数えきれないほどの天使の力と一緒に備わっていて、いつでも永遠にあなたを守る準備ができていることを覚えていなさい。

責任を受け入れよう

我々はこの人生で、自分で将来を形作ることができることがわかった。我々一人一人、毎日、明日を形作ろうとしている。今日は、明日の運命を決める。明日はその翌日の運命を決めていく。これはとても論理的であり、この思考法は過去にも遡って適用されうる。我々の行動によって、未来の運命を決めているのであれば、同じルールを過去にも当てはめられないのか？　もし、無限に続く連鎖のなかで、因果関係が交互に何度も繰り返されるのであれば、これらの連鎖の一つが説明されると、連鎖全体も説明することができる。したがって、この無限に続く時間のなかで、もしある部分を切り取り、それを説明して理解しているならば、また自然は調和されていることが真実ならば、同じ説明がすべての時間の連鎖にも適応されなければならない。この短い時間の間に、ここで我々が自身の運命をどうにかしようと生きているのが真実であれば、もし、我々が今見るものすべてに原因が間違いなくあるのが真実であれば、我々が今ここに存在することが、すべて過去の結果であることも真実である。したがって、あなた自身以外の誰も、あなたの運命を作る必要はない。世の中の悪は、我々によって引き起こされた。我々がすべての悪を引き起こした。そして邪悪な行動の結果、常に悲惨な状況を目にしている。世界に存在する悲惨さはまた、過去の人の弱さの結果とも言える。したがって、この論理によれば、人間だけに責任がある。神は責められない――神は永遠に慈悲深い父なので――責められることは全くない。「我々が蒔いた種は我々で刈るのである」。

人の至高の運命

ブラフマンの知識は、最終的な目標である。人の至高の運命である。しかし、人はいつもブラフマンと同一であることができない。ブラフマンと分離したとき、何か従事しなければならないことがあるはずである。その時、人は、任務を続けるべきで、人々の心の幸福に貢献する。したがって、調和という精神でジヴァの奉仕をするように私は強く薦める。

どんなに模索しても、神から光がもたらされることほど、人間の心にとって大切なものはない。現在であろうと過去であろうと、魂や神や人間の宿命についての研究ほどに、人間のエネルギーを要するものはない。我々は日々の職業、野心、仕事、苦しみのまっただ中に身を沈めていたとしても、ときどき一時停止するときが来る。マインド（心）は停止して、この世界を超えた何かを知りたいのである。ときどき、感覚を越えた領域を垣間見て、その結果そこへたどり着こうと苦闘するのである。そういうわけで、これは歳月をかけ、あらゆる国で行われる。人は、先を思い描こうとし、自分を拡げたいのである。我々が進歩と呼ぶもののすべて、進化は、いつも一つの模索、人間の宿命・神への模索によって図られているのである。 ■

スワーミー・ヴィヴェーカーナンダ

－　神戸　朋子

今までの、日印文化交流の歴史の中で、タゴールと天心の交流や、タゴールの来日のことは、少なからず知られてはいたが、ヴィヴェーカーナンダと天心の交流や、その来日については、殆んど知られていないのが、日本の現状だと思う。

しかし、ヴィヴェーカーナンダの思想には、今こそ日本をはじめ、全世界の人々へ広く宣べ伝えられるべきメッセージを含んでおり、そしてまた耳を傾けるべき時だと思う。

それは、物質文明から精神文明へと、舵を取らなければ、今や人類は、滅亡への道をたどる危機が迫ってきているからである。

ヴィヴェーカーナンダは、政治や権力ではなく、精神に重きを置いたが、根本的な第一義は精神の世界であることを認知していたからである。そこから霊性への目覚めを促している。現代は心を病み、自信を損失している人々が増え続けているが、それは自然との共存の生活から離れ、物質文明のもたらす果てのない様々なものへの欲求が心の平安を奪い、人間本来の心を見失うことになっているからである。

ヴィヴェーカーナンダの言葉は、なんと力に満ちていることだろう。「神への進行を持つ前に、まず自分自身への信仰を持たねばならない。」という自己に対する信仰と自己への敬意を呼びかけている。これは、自己中心の未熟な自己ではなく、絶対の存在と知識に至る次元の高い自己にである。無限の自己に達したら、そこから力とエネルギーが得られる、と述べている。

「神は私たち一人一人の中におられ、各々が事故の神性を再発見するために生まれているのである」ことを、教えられた。

現代は働くことに重きを置き、考える時間は持てないという社会になっているが、「永遠に生きることができるのは霊であり、元来人は普遍なるものであり、有限なものではない」と述べているが、このように人間の本性について沈潜することは、今や忘れ去られているのが現状である。

一方宗教上の問題では、今も世界中のどこかで民族紛争や内戦がおこっており、数知れぬ人々の生命が失われ、敵意と憎悪と苦しみが渦巻いている。そして人々の傲慢と貪欲が、地球を汚染し破壊し続け瀕死の状態となっている。その上あくなき利潤追求と、急速な科学技術の発展とその乱用が、それに拍車をかけ、人々の生命を慈しみ育むためではなく、破壊のために悪用されているのが現状である。

ヴィヴェーカーナンダは述べている、「どこに神を求めるべきなのか？貧しき者、不幸な者、弱者は、我々の神なのではないのか？まず彼らを礼拝すべきではないのか?」このように苦悩に喘ぐ者に、深く心を寄せてともに苦しみ、彼らへの奉仕を説き、それを実践した生涯であった。

慈悲深く永遠なる善であられる御方へ祈りを捧げ、全世界が浄められ、全人類が生命を貰える道へと、舵を取らなければならないことを述べている。

「世界中にあるような宗教は、それぞれが行っている礼拝の形式に違いはあるが、本当は一つなのだ」と述べているが、宗派主義、頑迷、狂信が世界を暴力で満たし、文明を破壊し、民族を絶望に陥れていることを知っていた。

このようにヴィヴェーカーナンダは、世俗の欲望の道ではなく、放棄の道を歩んだのである。

そして泡の歌のように、霊性の泉は、尽きることなく溢れ出た。

歌え、山よ　雲よ　大いなる風よ！
歌え、歌え　神の光輝を！
歓びをもって歌え、汝らすべての太陽よ　月よ　星よ！
歌え、歌え　神の光輝を！

このように天と地に遍く現れている神の恵みを歌っている。

ヴィヴェーカーナンダは、神秘思想家でもあり、「実在」の直観体験を持っていた。その源から尽きることのない思想と人々の魂を覚醒させるメッセージを発し続けている。

そして「自分はブラフマンと一つであり、全世界は同じブラフマンであるという事を悟りなさい」と述べているが、世界の文明の調和と全世界に平和が訪れることを願っていた。

今こそヴィヴェーカーナンダのメッセージに込められた普遍の真理が、時空を超えて遍く及び、日本でも理解され、霊感を享受できる日が訪れることを切望してやまない。■

野望の大きい若者が霊性の修行課程を修了しただけで、指導者になりたいと強く思って新しい街にやってきました。そこで教えようとしましたが、若者の元に来る者は一人もいませんでした。その町で霊的な事柄に関心を寄せていたのは、ある一人の賢明で有名なラビの元に集まってくる多くの支持者たちでした。新前の若い指導者は業を煮やし、その老師に恥をかかせて、弟子が自分のところにやって来るようにしてやろうとある企てを立てました。ある日、一羽の小鳥を捕まえ、老師が大勢の弟子たちに囲まれて座っている所に出向いていました。

小鳥を手の中に持ち、老師に面と向かってこう言いました。「もしあなたが賢明であるなら、今教えてください。私の手の中の小鳥は生きていますか、死んでいますか」。老師が小鳥は死んでいるといえば、手を開く、そうすると小鳥が飛んでいく。老師は間違えたことになり、がっかりした弟子たちは自分の所にやって来るだろう。生きていると言えば、素早く手の中の小鳥を握りつぶす、そして手を開いてこう言う、「ご覧ください。小鳥は死んでいますよ」と。この場合も老師は間違ったことになり、自分は弟子たちを獲得することができるだろう。

若者は老師の前にどっかり座り込み、答えを要求しました。「もしあなたが賢者なら、教えてください。小鳥は生きていますか、死んでいますか」老師はたいそう憐れんで、ただ一言答えました。「友よ、正にそれは君次第だな」

スワミ・ヴィヴェーカーナンダとの
出逢い～ヴェヴェーカーナンダ・ロックの思い出

－新田ゆう子

インドの偉大な預言者である、スワミ・ヴィヴェーカーナンダとの最初の出逢いは、今から30年前のことです。20代に入って、インドの聖者のことやインド思想について簡単に紹介された雑誌や、有名なアーティストである横尾忠則氏の書いた「インドへ」という本を読み、どうしてもインドに行ってみたくなりました。その頃、まだスワミ・ジのことは全く知りませんでしたし、きちんとしたインド思想やヨーガについての知識もほとんどありませんでした。

旅のスタイルは、女性の友人と二人、バックパックを背負って、二等寝台（当時、三等はなくなっていたので、一番安い料金の車両です）を乗り継いでの貧乏旅行です。出発前、旅の計画をしている時に、とても好きな詩人の田村隆一氏（故人）が書いたエッセイ「インド酔夢行」を読んで、インド最南端のカーニャ・クマリ（ケープ・コモリン）のことを知りました。インド最南端であること、東から昇る朝日と西に沈む夕陽がそこで見られること、ベンガル湾・インド洋・アラビヤ海の三つの海流が一つに交わる場所であることを知って、是非ここに行きたい、絶対に行こう！と決意しました。計画当初から、同行の友人はケララ州のコバラム・ビーチで海水浴をしたいと希望していたため、カーニャ・クマリに行くことは、友人も同意してくれました。今に比べ、まだ南インドに行く外国人観光客は少なく、情報もあまり多くはありませんでした。「そこに、行ってみないと分からない」、そういう時代でしたが、そのカーニャ・クマリに行く思いは自分で考えても不思議なほど強く、そこがインド旅行の目的地のような気持ちで出掛けたのです。

日本を出発したのは二月の初め。飛行機が到着したデリーはまだ寒く、朝晩はセーターが必要なほどでした。まだ、インディラ・ガンジー首相が存命していましたので、空港の名前は、当時はパラム空港と言いました。デリーから、寝台列車を利用していくつかの土地に降り、有名な遺跡や寺院、インドの人の日常生活の場を巡りました。まず、汽車の駅に着くと窓口で寝台車の切符を買い、乗って目的地に着くと、駅にホテルの客引きが来ているので、値段を聞いてから、その人に付いて行って部屋を見せてもらい、値段と見合っていたら泊まるし、そうでなければ値切るか、他を探します。宿は、現地のビジネスマンや巡礼者が利用するホテルで、そう高くはない所を利用しました。南下するほどに、外国人の姿が減ってきます。しかし、インドに慣れてきたせいもあって不安はなく、段々、カーニャ・クマリに近づくという期待に、胸が躍りました。

南インドでの最初の地は、ケララ州のトリバンドラム。そこからバスで行ったコバラム・ビーチで、同行の友人は海水浴を楽しんでいましたが、インド人が少なく、外国人の保養地のようになっているビーチは、わたしにはあまり興味が持てませんでした。そこを出発し、カーニャ・クマリに向かった時は、もう嬉しくて、ワクワクしていました。トリバンドラム以南は、当時は鉄道がなくて、バスでの移動になりました。バスの運転はとても乱暴で、車間距離もなにもあったものではなく、よく事故が起きないものだと感心しました。また、休憩で立ち寄った茶店にトイレがないことにびっくり。店の人に「トイレは何処ですか？」と聞いて案内されたのは、店の裏の何もない空き地です。友人と、お互い壁になり、夜空を見上げながら、用事を済ませました。

深夜バスが翌朝カーニャ・クマリのバス・スタンドに着いた時のことは、今もよく覚えています。少ない費用で旅行する人のためのガイドブックとして人気がある、「地球の歩き方」に載っていたホテルの客引きが、バスの停留所に来ていました。何人かの客引きがいたのですが、そのホテルのボーイさんはまだ若くて感じが良かったので、値段を聞いて部屋を見に行き、そこに泊まることにしたのです。さて、早速、カーニャ・クマリの村（町ではありま

せんでした）を見て廻りました。しかし、これと言って見るものはなく、静かな舗装されていない道がどこまでも続く、のどかな田舎の村に、正直、がっかりしていました。夕方になって、夕陽をみようと西側の海が見える所へ行こうとしても、そんなに小さな場所ではありませんから、歩くだけで大変です。しかもあまり天気が良くなかったので、夕陽が海に沈むのは見られそうもありませんでした。歩いているうちに、家が沢山集まっている海の近くの集落に出ました。夕餉の支度をするためか、女性たちが公共の井戸に水を汲みに集まっているのです。その当時も日本ではもう見られなくなった平和な雰囲気の光景に、胸を強く打たれました。まるでドラマを見ているようで、今も忘れられません。到着した日はそれで終わりました。

翌日、朝日を見ようと早起きをしましたが、またもや曇り空。東を目指して海辺に行きました。漁をする船が出ていて、私たちは浜辺に座ったのですが、結局朝日が海から出てくるところを見ることは出来ず、あんなに期待していた気持ちがしぼんでいくのでした。日中、目的もなくまた村を歩いて廻りました。南インドはキリスト教信者も多いとのことで、立派なキリスト教会がありました。その前で記念写真を撮ったのが、今も大切に取ってあります。

それからまた歩いているうちに、フェリーの乗り場に行き当たったのです。もう見て歩くところもなくなって退屈していたので、すぐ乗ってみることにしたのです。どこに行くのかも分かりませんでした。カーニャ・クマリはタミル語です。もし行き先が英語で書いてあっても、行き先が何を意味するのか、その頃のわたしには知識がなかったから、分からなかったのです。フェリーの中で、インド人のおじさんに「ネパール人か？」と質問されました。インドに来て1ヶ月近くになろうとするわたしたちは（海水浴もしましたし）、色が真っ黒で、とても日本人に見えなくなっていました。

さて、フェリーは何分かで、小さな島に到着しました。そこには、誰かの記念館らしき建物が建っていました。こんな最南端の地の小さな島（岩という認識が、当時はありませんでした）に記念の建物が建つなんて、余程偉大な人に違いない、と驚きました。もう記憶が曖昧ですが、建物を見て廻り、フェリーの出発時間が来たので乗船し、村に帰りました。スワミ・ジの銅像があるのを、後年パンフレットを見て知りましたが、それは全く記憶にありません。その建物を離れる時に見た、一枚の写真・・・一つの部屋の上の方に掲げられた小さな一枚の写真は、今もわたしの記憶の中では光り輝いています。その写真の人は、スワミ・ヴィヴェーカーナンダ・ジ。その人が誰か、その偉業も全く知らなかったその時でさえ、その写真は光を放射して見えたのです。そのことが、今も不思議でなりません。また、今もその時の光景だけが思い出せるのです。

スワミ・ジのお名前や、どんな偉業を成し遂げた方かを知ったのは、それから10年以上経って、ヨーガの勉強のために読んだ本で、です。ヨーガの歴史や有名な聖者について簡単にわかり易く書いた本で、そこにはラーマクリシュナと、スワミ・ヴィヴェーカーナンダのことも簡単にまとめられていたのです。わたしが島だと思っていた場所は岩で、「ヴィヴェーカーナンダ・ロックメモリアル」と言う名であることやその由来が書かれ、岩の写真も掲載されていました。とても驚いたことは言うまでもありません。十数年前に行った時に貰った入場パンフレットを探し出して見て、あらためて感動しました。そのことを知った後に、書店でスワミ・ジの「カルマ・ヨーガ」や「バクティ・ヨーガ」を買い求め読みました。それらの本から、当時両親の介護をしていたわたしは、人生は単なる観念や現象界の物体を追い求めて生きるものではなく、もっと大きな力が働いているものであるということを学びました。簡単に言うと、「神」の力というものがあって、人間は自分の思い通りに生きられると思って様々な努力をしているけれど、そうではないのだということを理解したのです。面白いことにそのすぐ後、ヨーガ教室の友人が、当時絶版になっていたラーマクリシュナの生涯を書いた「インドの光」を古本屋で見つけてきて、わたしに貸してくれたのです。ラーマクリシュナの生涯は、サマーディという知識が全くなかったわたしにとってとても衝撃的で、頭が変になりそうでした。でも、その途中からナレーンとしてスワミ・ヴィヴェーカーナンダ・ジが登場すると、急に話しがリアルに感じられ、最後まで一気に読み進むことが出来ました。

それから、数年後、両親が亡くなり、自由に外出できるようになって、ヨーガ教室の掲示板に貼られた「スワミ・ヴィヴェーカーナンダ生誕祝賀会」のチラシを見て、初めて日本ヴェーダーンタ協会の催しに出掛けたのです。それから間もなく、ヨーガ教室を変えたのですが、そこの先生が偶然ラーマクリシュナの信奉者であり、協会の信者であることから、逗子の協会や「バガヴァッド・ギーター」の勉強会に通うようになりました。 三十年も前のスワミ・ジとの無意識の出逢いが、こうして今に至る一本の糸のようにつながっているのが、なんとも不思議でなりません。■

（ヨーガ講師、アートセラピスト．ハタヨーガを学び始め、様々なインドの聖者の思想と出会う。
4年程前から日本ヴェーダーンタ協会で『バガヴァド・ギーター』を学び始め、現在は協会のボランティアにも参加している。）